ভারতে ধর্মঘটের ইতিহাস

[১৮২৭—১৮৮৫]

বাসুদেব মোশেল

: পরিবেশক :

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : দোলযাত্রা : ৭ই মার্চ ১৯৫৮

প্রকাশক :
রুশো মিত্র
সাহিত্য প্রকাশ
৬০ জেমস লঙ সরণি
[পূর্বতন, সত্যেন রায় রোড]
কলিকাতা ৩৪

প্রচ্ছদ :
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ :
ইম্প্রেসন হাউস
কলিকাতা ৯

মুদ্রক :
শ্রীমতী রেখা দে
শ্রীহরি প্রিন্টার্স
১২২/৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

পিতামহী শীতলাদেবীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

ঝুমঝুমিঞা

সখারাম গণেশ দেউস্কর ও ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ [প্রবন্ধ]

পুরাতনী [সম্পাদিত]

যন্ত্রণায় ছিটে ফোঁটা [কাব্য গ্রন্থ]

নিবেদন

আধুনিক বিশ্বে 'স্ট্রাইক' ['Strike'] বা ধর্মঘট শব্দটি সবায়ের কাছেই অত্যন্ত পরিচিত। শ্রমজীবী মানুষ এও জানে যে, তাদের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে 'ধর্মঘট' অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। তাই সারা বিশ্বের শোষিত মানুষের কাছে 'ধর্মঘট' হয়ে উঠেছে লড়াই-এর একটি নীতিগত কৌশল। যুদ্ধের এই কৌশলকে, কত রকম বিষয়ের ক্ষেত্রে, কত রকম প্রয়োজনে সারা বিশ্বেই যে ব্যবহার করা হয়েছে তার আলোচনায় নতুন এক মহাভারত রচনা করা যেতে পারে। ফলে, ধর্মঘট চলছে-চলবে। সহিংস-অহিংস সব পন্থীরাই একে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না এই ধর্মঘটের আসল উৎস কোথায়? বা এই ধর্মঘট শব্দটির বয়স কত? এ-সম্পর্কে যথার্থ ইতিহাসই বা কি? সেই সন্দেহের অবসান ঘটাতেই আমি কিছুকাল আগে অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হয়ে এবং ধর্মঘটের সংজ্ঞা, ধর্মঘটের অতীত ইতিবৃত্ত, কিংবা ধর্মঘটের প্রথম পর্যায় কেমন ছিল ইত্যাদি সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য আহরণ করি, যার ফল এই গ্রন্থ। এমন কি এই গ্রন্থ রচিত হওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে যে, আরও অনেক বিষয় অকথিত রয়েছে। এমন কি, এই রকম একটি অভিনব বিষয়কে গ্রন্থবদ্ধ করতে গিয়ে নানা অসঙ্গতি, মুদ্রণ প্রমাদ ও পারিপাট্য জনিত ত্রুটিকেও এড়াতে পারিনি। আশা করি সহৃদয় পাঠক প্রাথমিকের দুরূহ প্রচেষ্টাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করবেন। সেই সঙ্গে আমিও চেষ্টা করবো যাতে পরবর্তী সংস্করণে উক্ত ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করে নিয়ে বিষয়টিকে আরও সংহত ও পরিচ্ছন্ন রূপে উপস্থিত করতে পারি।

এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণের কথা স্বীকার করতেই হয়। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-পুঁথিপত্র, বৃটিশ যুগের কিছু মূল্যবান নথিপত্র দেখারও প্রয়োজন হয়েছে। কাজেই এগুলি যিনি বা যাঁরা অবাধে দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তাঁদের সকলের কাছেই ঋণ স্বীকার করি। এদের মধ্যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শ্রীরতন দাসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য ও কারণ, তাঁর সাহায্য ব্যতীত এই গ্রন্থ রচিত হওয়াই দুরূহ ছিল।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গ্রন্থ-অধিকর্তা শ্রীঅরুণকুমার বসু এবং তাঁর সহকর্মী শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য তাঁদের গ্রন্থাগারের বইগুলি সময়ে-অসময়ে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে দিয়ে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থে ব্যবহৃত ছবিগুলি তুলে দিয়ে বন্ধুবর শ্রীসৈকত সান্যাল বন্ধুকৃত রক্ষা করেছেন সেজন্য তাঁকেও ধন্যবাদ।

এ-ছাড়াও যিনি ঘরের খাইয়ে আমার অর্থনৈতিক সংকট মোচন করে, আমাকে নিরুদ্বিগ্ন কর্ম সাধনায় নিয়োজিত রেখেছেন আমার সেই জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ মোশেল এবং বৌদি শ্রীমতী কৃষ্ণা মোশেলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এই গ্রন্থের পরিকল্পনা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিমার্জনার বিষয়ে বিশিষ্ট প্রবন্ধকার এবং আমার অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক ড. শ্রীসনৎকুমার মিত্র আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, এজন্য তাঁকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আমার বন্ধু ও বিশিষ্ট প্রকাশক শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার এবং 'সাহিত্য প্রকাশে'র কর্ণধার অনুজপ্রতিম শ্রীরূশো মিত্রকে আমার গ্রন্থপ্রকাশ ও তদ্‌বিষয়ে সুপরামর্শ দেওয়ার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে সবিনয় নিবেদন করি যে, অনবধানতার দরুণ পাদটিকার সংখ্যা-ক্রম বজায় রাখায় কিছু ভুল হয়েছে এবং আট সংখ্যক পরিচ্ছেদটি সাত ছাপা হয়ে গেছে। আশা করি পাঠকগণ সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করে করবেন।

শ্রীবাসুদেব মোশেল

সূচীপত্র

'নয়া ইতিহাস লিখেছে ধর্মঘট
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।'

সুকান্ত ভট্টাচার্য

‘রেল ধর্মঘট’ [১৮৮৪]

শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-শ্রমজীবী।

সচিত্র মাসিক পত্র।

'নীল কুঠি

১.
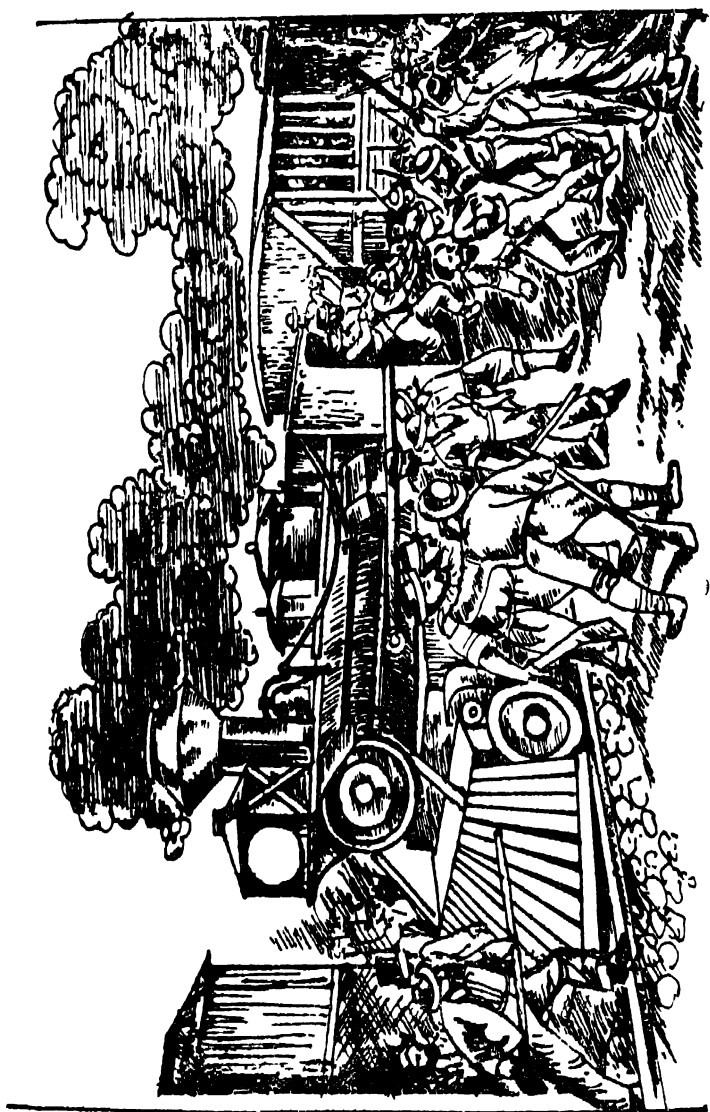
সূচনা ঃ

'ধর্মঘট' শব্দটির সঙ্গে আজ আমরা সবাই বিশেষভাবে পরিচিত, কিন্তু ভারত-বর্ষের মানুষ ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত 'ধর্মঘট' শব্দটি সম্পর্কে সচেতনভাবে অবহিত ছিলেন না। তাই বলে, আমাদের দেশে ধর্মঘটের ইতিহাস আধুনিক নয় বরং ভারতে ধর্মঘটের ইতিহাস বেশ প্রাচীনই। ভারতে মধ্য-যুগের ইতিহাসে অর্থাৎ মুসলিম শাসনে ধর্মঘট বা হরতালের চিত্রায়ণ বিভিন্নভাবে দেখা গেছে। মুঘল শাসনব্যবস্থায় মুঘল আমিরদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করতে বা প্রতিবাদ জানাতে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় নানাভাবে নানা সময়ে 'হরতাল' বা 'ধর্মঘট' পালন করেছে। মুঘল যুগে, তথা 'মুঘল-ই-আজম'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 'হরতাল' বা ধর্মঘট পালনের কথা জানা যায়। বিশেষ করে 'মিরাট-ই-আহ্‌মদির' তথ্য থেকে জেনেছি যে, ভারতীয় বণিকদের বিক্ষোভ ও প্রতি-বাদের বহিঃপ্রকাশ 'হরতাল' বা 'ধর্মঘটের' ভিতর দিয়েই ঘটেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বিশেষ একটা সময়ে অর্থাৎ দক্ষিণাত্যের কুতবশাহী শাসনের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানাতে হায়দ্রাবাদের মহাজনেরা হরতাল ও বন্ধ পালনের সাহসিকতা দেখায়।[১] তাঁরা 'হরতাল' পালনে সফলতা অর্জন করেছিল বলে ঐতি-হাসিকরা স্বীকারও করেছেন। ঐ সময়েই আদিল শাহির রাজ্যে বণিকদেব কয়েকটি অঞ্চলে হরতাল পালনের সংবাদ ইতিহাসে উল্লেখিত হতে দেখি। এমন কি মুঘল যুগে ১৬৩০ সালে ব্রোচে এবং ১৬৮৬ সালে মাদ্রাজের তন্তুবায় সম্প্রদায় অত্যাচার ও মুঘল করনীতির বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হয়ে ব্যাপকভাবে ধর্মঘট পালন করে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।[২] ১৬৬৮ থেকে ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সামান্য একটি ধর্মান্তরিতকরণকে কেন্দ্র করে সুরাটের বণিক সমাজ 'হরতাল' পালন করে মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে প্রতি-বাদীর ভূমিকা নিয়েছিল।[৩] মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এ-ধরণের ঘটনায় 'হরতাল' স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই পালিত হতে দেখা গেছে।

মুঘল শাসকদের মধ্যে ঔরংজীবের আমলে সরকারী করনীতির প্রতিবাদে দিল্লীর বণিকরা 'হরতাল' ও 'বন্ধ' পালন করে অত্যাচারী শাসকের

বিরুদ্ধে তাঁদের অনাস্থার সামগ্রিক পরিচয় প্রদর্শন করেন। মুঘল যুগে 'হরতাল' তথা 'ধর্মঘটে'র ব্যাপক প্রচেষ্টা সাম্রাজ্যের সর্বত্রই লক্ষ্য করা গেছে। আকবরের আমলেও কর বসানোয় কারিগরেরা 'হরতালের' ভিতর দিয়ে নানা সময়েই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানিয়ে এসেছে।[৪] মুঘল শাসনে করের পীড়নে কারিগর বা শিল্পীদের জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে ওঠে। কারিগর বা শিল্পীদের জীবন যাত্রার চরম দুরবস্থার কথা পর্যটক বোর্ণিয়ের রচনার মধ্যেই মেলে। নানা বৃত্তির কারিগর ও কারু শিল্পীরা প্রতিদিন সকালে উঠে কারখানায় যান—সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনী খেটে আবার সন্ধ্যায় যে যার বাড়ী ফিরে আসেন। তাঁদের জীবনে কোন শখ বা আহ্লাদ বলে কিছু ছিল না। তাঁদের জীবনে কোন আশা-আকাঙ্ক্ষাও ছিল না, কোন উন্নতিও ছিল না। এমন কি অন্য কোন পেশাতেও তাঁরা নিযুক্ত হতে পারতেন না। এক কাজের বদলে অন্য কাজ শেখার ব্যবস্থা মুঘল শাসনে ছিল না।[৫] এহেন শাসন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই মধ্যযুগের মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই 'হরতাল' বা ধর্মঘটের ভিতর দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে,—বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

মুঘলযুগে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল তার বর্ণনা মেলে মানুচির লেখা থেকে: 'আকবরের বিরুদ্ধে জীবিত অবস্থায় প্রতিশোধ নিতে না পারায় আগ্রার জাঠ কৃষকেরা আকবরের সমাধি আক্রমণ করে ব্যাপক লুঠতরাজ করে এবং আকবরের দেহাবশেষ খুঁড়ে বার করে জ্বালিয়ে দেয়।'[৬] অষ্টাদশ শতকের জনৈক বিদেশী পর্যটক মুঘল শাসনে এ-ধরণের প্রজা বিদ্রোহের ঘটনা নানা স্থানেই সচক্ষে দেখেছেন। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে মুঘল যুগে ভারতীয় বণিক ও শ্রমিকদের হরতাল পালনকে প্রতিবাদের স্বাভাবিক ঘটনা এবং রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের একটি মাধ্যম বলে বর্ণনা করেছেন তৎকালীন বিদেশী পর্যটকগণ।[৭] সেকালে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে যে সমস্ত হরতাল বা ধর্মঘট পালিত হয়েছিল তা যে কোন শোষণের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে 'মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সুসংবদ্ধ সমাজ-রাজনৈতিক চেতনায় কোন না কোন ভাবে একটা ছাপ ফেলেছিল, একথা অনস্বীকার্য।'[৮]

ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে হরতাল বা ধর্মঘটের দৃষ্টান্ত বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হলেও, মধ্যযুগের মুসলিম

ইতিহাসে 'হরতাল' বা 'ধর্মঘট' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল, তা কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ঐতিহ্যের সঙ্গে তেমন ভাবে মেলে না। তবে প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে যে একটা যোগসূত্র ছিল তা সে-কালের ধর্মঘটের সংগে তুলনার মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ প্রাচীন ভারতে ধর্মঘটের অর্থ, সংজ্ঞা বা প্রকৃতি যে ভাবে নির্ধারিত হয়েছে, তার সঙ্গে পরবর্তী-কালের 'ধর্মঘট' বা ঐ ধরণের আন্দোলনের প্রকৃত অর্থ যে পরিবর্তিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন ভারতে ধর্মঘটের যে প্রকৃতি ছিল তার অর্থ, সংজ্ঞা ভিন্নতর, তার সঙ্গে রাজনীতি বা অর্থনীতির তেমন কোন যোগ ছিল না। বরং ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসের যোগটিই বেশী করেই চোখে পড়ে। এবং সেদিনের ধর্মঘটের সংজ্ঞায় গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক চেতনার সামগ্রিক আভাসটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

: প্রাচীন ভারতে ধর্মঘটের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিচার :

প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাসে 'ধর্মঘট' ব্যাপারটা কি রকম ছিল ? তা জানার জন্য বিভিন্ন অভিধান অনুসরণ করে দেখি ঃ 'ধর্মঘট' হোল 'ধর্মার্থে বৈশাখমাসে প্রত্যহ দেয় গঙ্গোদকপূর্ণ সভোজ্য সদক্ষিণা চন্দনাক্ত কলস। কিংবা, ধর্মসাক্ষীপূর্বক স্থাপিত ঘট [বারি]। 'ধর্মঘট আগে করি, বলে চান্দ অধিকারী, শুন মাগো সাহ রাজার ঝি। ধর্মাধর্ম এই ঘটে তুলে দেখি অকপট, [বি. পা. ৩৭৫]।[৯] কিংবা 'কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের সকলে সমবেত হইয়া কোন কার্য করা বা না করা সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা করে। কিংবা বাণিজ্যের পূর্বে দোকানদারেরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য অথবা কোন দ্রব্য এই নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিব তার কম মূল্যে বিক্রয় করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘটস্থ ধর্মকে সাক্ষী রাখিত বলিয়া এই নাম।'[১০] প্রাচীনকালে হিন্দুদের আর একটি ধর্মীয় প্রথা বা ব্রতের ভিতরেও ধর্মঘটের মহান তাৎপর্যের কথাটি ধরা পড়েছে। মহাবিষুব সংক্রান্তির অক্ষয় তৃতীয়া অথবা সৌর বৈশাখের যে কোন দিনে জল পূর্ণ ঘট উৎসর্গ আনুষ্ঠানিক বীজমন্ত্রের মধ্যে 'ধর্মঘট' কথাটির উল্লেখ বেশ অর্থবহ ও তাৎপর্য মণ্ডিত : 'ওঁ এষ ধর্মঘটো দত্তো ব্রহ্ম-বিষ্ণু শিবাত্মক। অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ।'[১১] অর্থাৎ এই অনুষ্ঠান বছরের সূচনাভাগে ঘট উৎসর্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্মের নামে জল পূর্ণ ঘটকে সাক্ষী রেখে কিংবা কোন কিছুর সাফল্য কামনা করে যে প্রার্থনা

বাণী উচ্চারণ করা হয়ে থাকে ঘটের সামনে, সেই ঘটকেই 'ধর্মঘট' স্নানে ও ধ্যানে আজও পূজা অর্চনা করে বলতে শোনা যায়: 'ওঁ ঘট ত্বং ধর্ম রূপোহসি ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা। ত্বয়ি লিপ্তে সন্তু লিপ্তাশ্চান্দনৈঃ সর্বদেবতা।'[১২] আমাদের দেশীয় পঞ্জিকা মতে এটি 'ধর্মঘট' ব্রত রূপে পরিচিত।

বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে 'ধর্মঘট' শব্দটি বেশ তাৎপর্যবহ। ভারতীয় সমাজ গড়নের ইতিহাসে বর্ণ বিভাজন ব্যবস্থার জাতিগত ঐক্যের ক্ষেত্রে যেমন এক ধরণের সংহতি খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি তার সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের ভূমিকাও ছিল অপরিসীম। সে যাই হোক, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণ বা জাতিগত ঐক্যের ক্ষেত্রে বংশ পরম্পরায় সকলে একই কাজ করতেন। স্বর্ণকারের পুত্র সূত্রধর হতে পারতো না। চিত্রকর কখনও তন্তুবায় হতে পারতো না। এক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক শিল্পকর্মের সঙ্গেই জাতিগত বর্ণবিভাগের প্রশ্নটি ছিল জড়িত। স্বর্ণকার, কর্মকার, সূত্রধর, তন্তুবায় প্রভৃতিরা কেবল বিশেষ এক এক ধরণেরই শিল্পীই ছিলেন না, তাঁরা এক-একটি স্বতন্ত্র জাতি বা শ্রেণী হিসাবে মর্যাদা পেতেন। এবং সেই মর্যাদাবোধ অক্ষুন্ন রাখার ব্যবস্থা ছিল বর্ণব্যবস্থায় কঠোর-বাধা নিষেধ আরোপের মাধ্যমে। 'বৃত্তির সঙ্গে বর্ণের বা জাতির যোগ কিন্তু তথা কথিত নিম্নজাতির লোকেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ছিল। কতকগুলি জাতির নাম থেকেই তাদের বৃত্তি বোঝা যেত, যেমন—কুম্ভকার, কর্মকার তন্তুবায়, তৈলিক ইত্যাদি। এই সব বৃত্তি—পরিচালিত জাতিগুলির [trade castes] সঙ্গে মধ্যযুগের ইউরোপের trade guild-গুলির কিছুটা সাদৃশ্য আছে। জাতিভেদ প্রথার সামাজিক বিধিনিষেধগুলিও এই সব জাতির মধ্যে কঠোরভাবে পালিত হত। বৃত্তির সঙ্গে বংশানুক্রমিক জাতিভেদ প্রথার এই .সংযোগ সমাজের পক্ষে যে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর ছিল তা বলা যায় না। এই ব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক শোষণ, মনুষ্যত্বের অবমাননা ইত্যাদি সবই ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কও স্বীকৃত হয়েছিল। সমাজের প্রয়োজনে স্বীয় গুণ বা প্রতিভা অনুসারে যে ব্যক্তি যে কাজ করে, সে কাজেই সে বংশানুক্রমিক ভাবে নিযুক্ত থাকবে; এবং সমাজও সেই ব্যক্তিকে ও তার বংশধরদের জীবিকার অভাবে মরতে দেবে না, এই নীতিই ছিল জাতিভেদ প্রথার ভিত্তি। ভারতের কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজে এইভাবে

একটি প্রতিযোগিতা-বিহীন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল এবং মোটের উপর এই ব্যবস্থা যে কয়েক হাজার বৎসর ধরে ভারতীয় সমাজকে সন্তুষ্ট রেখেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'[১৩] এবং সেই কোন সুদূর প্রাচীন কালে বর্ণব্যবস্থার ভিতরেই সামাজিক ব্যবহার বা আচার-আচরণগুলিও ছিল দৃঢ়বদ্ধ। কোন ব্যক্তি বা বর্ণ সামাজিক গণ্ডীর বাইরে কোন কিছু করতে সাহস পেত না। সেজন্যেই সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ-বন্ধন, লৌকিকতা প্রভৃতি সবাই সে যার জাতি তথা বর্ণ বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যে যার গণ্ডীর ভিতরেই জীবন-যাপনের উপায় অনুসন্ধান করেছে। তাই 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'তে দেখা যায়:

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পূজা ঘরে ঘরে
চাউলের কোচড়া বান্ধে টান ॥[১৪]

যদি কোন ব্যক্তি তার সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করতো তার জন্যে সামাজিক অনুশাসনও ছিল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। সে জন্যেই হয়তো জাতি-ধর্ম লঙ্ঘন সম্পর্কে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে এই ভাবেই:

জাতি ধর্ম লজ্জি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমতে বা পাইবে নিস্তার ॥[১৫]

কেবল পরলোকের কথাই নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে সামাজিক সংহতির প্রশ্নেও "শিল্পী ও শ্রমজীবী জাতি সকলেই তদানীন্তন কালে গৃহস্থ বিশেষকে 'ঠেকো' করে রাখতেন। আর ঠেকো করার পদ্ধতি থেকেই বাঙলায় 'ধর্মঘট' শব্দটির উৎপত্তি।[১৬] 'ঠেকো' কথাটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পরিষ্কার না হলে 'ধর্মঘট' শব্দটির অর্থ বোধিগম্য হবে না। 'ধর্মঘট' কথাটি সমাজে ব্যাপ্তিলাভ করেছে, তা জানতেও 'ঠেকো' কথাটির অর্থ ও ব্যাখ্যা বিশদ-ভাবেই করার প্রয়োজন আছে। 'ঠেকো করার প্রথম ও প্রধান উপায় ছিল ধর্মঘট।'

সেকালে যে শিল্পী, জাতি বা গৃহস্থ 'ধর্মঘট' স্থাপনা করতেন, সে বা সেই জাতির প্রধানগণ আপন আপন জাতির প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করে গ্রাম-শহরে কিংবা বারোয়ারীতলায় বা শিব মন্দিরের সামনে জড়ো করতেন।

সেই চত্বরে অনুষ্ঠিত সমবেত সভায় তারা জাতিগত বা ব্যক্তিগত অভিযোগের কথা ব্যক্ত করতেন এবং পরে এ নিয়ে 'ঘোঁট' হোত। 'ঘোঁট' শব্দের অর্থ debate, discussion. বিষয়টাকে ঘুঁটিয়ে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার খাঁটি বাঙলা শব্দই হোল 'ঘোঁট', এই ঘোঁট শেষ হলে পুরোহিত ডেকে ধর্মরাজের ঘট স্থাপনা হোত। এই ঘটস্থাপনা ধর্মযাজী 'পণ্ডিত' আখ্যাধারী ব্যক্তির দ্বারাই করা হতো। ঘট জলপূর্ণ করে তার মুখে আম্র পল্লব সাজিয়ে দেওয়া হোত। ঘটের গায়ে তেল সিঁদুর দিয়ে একটা চক্র অঙ্কিত হোত এবং অঙ্কিত চিহ্নের নীচে যে গৃহস্থের বিরুদ্ধে ধর্মঘট স্থাপনা করা হয়েছে, তার নাম লেখা হোত। নিয়মিত ধর্মরাজের আহ্বান ও পূজার পর পান-ভোজন করানো হোত। ঘটের সামনে এক তাড়া পান, সুপারি এবং হরিদ্রাখণ্ড সঞ্চয় করে রাখা হোত। ভোজের শেষে প্রত্যেক জাতির মাতব্বরগণ—একটা পান, একটা সুপারী ও একটা হরিদ্রাখণ্ড নিয়ে ঘট স্পর্শ করে শপথ করতেন যে, আমি অদ্যকার ঘোঁট অনুসারে, স্থিরকৃত ব্যবস্থানুসারে অমুক গাঁয়ের অমুক ব্যক্তিকে বা সম্প্রদায়কে আমরা স্বীয় শিল্প-জাত সামগ্রী যোগাব না। অদ্য ধর্মরাজের পান সুপারী গ্রহণ করলাম, হুকুম অমান্য করবো না এবং আমার গ্রামের সকলকে হুকুম মতো কাজ করতে বাধ্য করবো। এই সংকল্প শেষ হলে, ঐ ঘট মাথায় করে অভিযোক্তার দল দূর-দূরান্তের গ্রাম-সমূহে ঘুরে বেড়াতেন। একজন ঢাকী ঢাক বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগের বার্তা শোনাত এবং সামাজিক ঘোঁটের মীমাংসা গ্রামবাসিগণকে বলতেন। এই ব্যবস্থা থেকেই বাঙলায় একটা প্রবচনপ্রচলিত হয়েছে:

আর কি রক্ষে আছে,
ঢাকে কাঠি পড়েছে।[১৭]

এই ধর্মের ভাবে ঢাকে কাঠি পড়লে কুৎসা নিন্দা দেশময় ছড়িয়ে পড়তো, একটা পরগণার মধ্যেই আর অভিযুক্ত ব্যক্তি বাস করতে পারত না। তার ধোপা, নাপিত, ঘরামী, তলবদার নফর, তল্পিদার প্রভৃতি সকল জনবলই নষ্ট হোত। ধোপা তার কাপড় কাচত না, জলবাহী জল যোগাত না, ঘরামী ঘর ছাইত না, এমন কি মেথর মুদ্দফরাসও তার সহায়তা করতো না। এ অতি দুর্জয় শাসন ছিল, সমাজের এই ভীষণ শাসন মুসলমানেরাও মান্য করে চলতে বাধ্য হয়েছে। 'ঠেকো'র ঘরের কাউকেও মুসলমান ইমামগণও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করত না। মুসলমান মতে পাপ স্খলন করলে 'পাক' হলে

তবেই তেমন ব্যক্তি ইসলাম ধর্মান্তরিত হতে পারতো। সুবাদারী খাস দপ্তরে একজন খাসনবীশ থাকতেন, তিনিই এই সকল সামাজিক ব্যাপারে বিচার ব্যবস্থা করতেন। পাঠানদের আমলে ধর্মঘট বসলে ফৌজদারকে বা গ্রামের কাজী মুফতীকে এত্তালা দিতে হোত, অর্থাৎ তাঁর কাছে তাবৎ বিবরণ সমেত এক পত্র পাঠাতে হোত। এ ধরণের সামাজিক অনুশাসনে রাজা-প্রজা, জমিদার-ধনী ও নির্ধন কেউই বাদ যেতো না। এর ফলে সামাজিক ভারসাম্য কখনও বিনষ্ট হোত না বরং এ ধরণের সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে সমাজ-ব্যবস্থায় এক ধরণের জাতিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বড় বা ছোট ভেদাভেদ ছিল না। সামাজিক শাসন সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োজ্য ছিল। একদা মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে তন্তুবায় শ্রেণী ধর্মঘট পালন করলে, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীও সে ধর্মঘটে ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। কেন মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালন করা হয়েছিল? সে ঘটনার দিকে আলোকপাত করা এ-প্রসঙ্গে অত্যন্ত জরুরী বলেই মনে করি। কারণ সেকালে সামাজিক অবস্থায় 'ধর্মঘটে'র অনুশাসন কতখানি নির্মম ছিল, তা সেকালের পটভূমিতে দেখলে ধর্মঘটের মূল প্রেরণা আরো বেশী অর্থবহ ও বোধগম্য হয়ে উঠতে পারবে।

ভাদুরের নন্দকুমার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় মুর্শিদাবাদের নবাবী সেরাস্তায় একটা বড় রকমের চাকরী পেয়েছিলেন। নবাবী সেরাস্তার চাকরী পেয়ে প্রায় রাতারাতি তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। হঠাৎ নতুন ধনী হয়ে তিনি বাড়ীতে দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে যাবতীয় জিনিস-পত্তর, সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় কাপড-চোপড়ও মুর্শিদাবাদ থেকে কিনে আনেন। এতে ভাদুরের তন্তুবায়ের দল মহারাজের উপর ওঠেন ক্ষেপে। তাঁদের অসন্তুষ্টি রীতিমতো প্রতিবাদী ভূমিকা নেয়। তাঁরা সদলবলে নন্দকুমারের কাছে হাজির হয়ে তাঁদের ক্ষোভের কথা জানালেন। কেউ কেউ বললেন, 'এ কি ঠাকুর। তোমার দুর্গোৎসবে, তোমার অসময়ে সু-সময়ে আমরা চিরকাল, পরিবারবর্গকে কাপড় যুগিয়ে আসছি। আমাদের কেনা কাপড়েই তো এত কাল ধরে দেবীর পুজো হয়ে আসছে, আর আজ তুমি হঠাৎ ধনী হয়েছো বলে কি আমাদের কাপড় নেবে না? বিদেশ থেকে কাপড় এনছো ভাল কথা, তার সঙ্গে আমাদেরও তাঁতের কাপড় তোমাকে নিতে হবে'।

মেজাজে ও চাল-চলনে নন্দকুমার তখন এক অন্য মানুষ। তন্তু-

বায়দের কথা তাঁর কানে গেল না। অবশেষে গাঁয়ের তন্তুবায় শ্রেণী—তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ধর্মঘট ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। ক্রমে সেই ধর্মের ঘট উত্তর থেকে দক্ষিণ রাঢ়ের সর্বত্রই ঘুরে এলো। পশ্চিম বাঙ্‌লার তন্তুবায় সমাজ কঠিন ব্রতে অটল রইলেন। মহারাজা নন্দকুমারকে আর কোন তাঁতি কাপড় যোগাবে না। ক্রমে ক্রমে তন্তুবায়দের ধর্মঘটকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে বাংলার অন্যান্য বৃত্তি-সম্প্রদায়ের লোকেরাও সে ধর্মঘটে যোগ দিলেন। বৎসরকালের মধ্যে মহারাজ নন্দকুমারের এমন দশা ঘটলো যে পশ্চিম বা মধ্য বাঙ্‌লার কোন হাটে বা গঞ্জে তাঁকে কেউ কাপড যোগাত না। এমন কি নিজের গাঁয়েও ঢুকতে পারতেন না। মুটে মোট বইতো না, নাপিত কামাতো না, ধোপা কাপড় কাচতো না। অথচ আভিজাত্যের দিক থেকে এবং সমাজের গণ্যমান্যদের একজন হয়েও তাঁকে নিদারুণ বিপাকে পড়তে হলো। নন্দকুমারের পরিচয় হলো হুগলীর ফৌজদার এবং মুর্শিদাবাদের নিজামতির নায়েব দেওয়ান হিসাবে। অবশেষে সেই নন্দকুমারকেও তন্তুবায়দের ধর্মঘটের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। তন্তুবায়ের দল ধর্মঘট তুলে নেওয়ার পর নন্দকুমার স্বয়ং নিজের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা নিজেই করেছিলেন। তৎকালীন একটা ছড়ার মধ্যে সেই ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে:

ভাদুরের নন্দ কুমার,
লক্ষ বামুন করলে শুমার।
কেউ পেলে মাছের মুড়ো
কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো।[১৮]

মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে তন্তুবায়দের ধর্মঘট পালনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করা যায় যে তৎকালীন বর্ণ-কাঠামো কত সুদৃঢ় ছিল।

প্রাচীন ভারতেও ধর্মঘট শব্দটি 'প্রতিজ্ঞা-পালন' অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। কারণ মহাভারতের সমাজেও ধর্মের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা থেকেই আমরা ধর্মঘটের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি খুঁজে পেতে পারি। ধর্ম শব্দের দ্বিবিধ ব্যুৎপত্তি। মহাভারতে ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দুটি অর্থের উল্লেখ করা হয়েছে। ক 'ধন পূর্বক 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'মক্' প্রত্যয়; যা করলে ধর্ম শব্দটি সিদ্ধ হয়। তার অর্থ যা থেকে ধন প্রাপ্তি ঘটে খ· দ্বিতীয় শব্দটি ধারণার্থক 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন্' প্রত্যয় যোগ করার মধ্যে নিষ্পন্ন হয়েছে। তার অর্থ—যা সকলকে ধারণ করে অর্থাৎ লোকস্থিতি যার উপর

নির্ভরশীল।[১৯] উল্লিখিত দুটি অর্থের যে কোন একটিকে অথবা উভয়কেই আমরা ধর্মশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। যার দ্বারা ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগতভাবে লোকস্থিতি বিধৃত; যাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকের জীবনযাত্রা চলছে অথবা যে বস্তু সদাচরণও সংক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থ-কামাদির প্রাপক, তারই নাম ধর্ম। এই ধর্মের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ধর্ম সমূহের 'ঘট' যুক্ত হয়ে ধর্মঘট মানুষকে মহত্তর আদর্শে এবং বিশ্ব কল্যাণে অনুপ্রাণিত করে। এবং এই ধর্মের সঙ্গে ঘট উৎসর্গের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিশেষে চরম উপায়কে প্রাপ্ত হয়। এবং স্থূল বিচারে বস্তুভিত্তিক ন্যায্য প্রাপ্যই ধর্মঘটের মৌল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল।

ধর্ম ও ধর্মঘটের প্রকৃতি অভিন্ন বলে স্বীকৃত। কারণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঐহিক প্রাপ্তির যোগসূত্র হিসাবে ধর্মঘট কালক্রমে জীবনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ফেলেছে। বলাবাহুল্য যুগধর্মের বিবর্তনের সঙ্গে 'ধর্মঘট' শব্দটি ব্যাপক অর্থের দ্যোতক হয়েছে: কোন কিছুর প্রতিকার বা প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা করা কিংবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করাকেই বুঝায়। আরো গভীর অর্থে বলতে গেলে প্রতিজ্ঞাপূর্বক কর্ম বন্ধ করা [to strike]-কেই সর্বসম্মতভাবে সারা বিশ্বের জনগণ স্বীকার করে নিয়েছে। তবে কোন কোন প্রবক্তার মতে ধর্মঘটের যথার্থ কোন সংজ্ঞা নেই। এ প্রসঙ্গে লর্ড চিফ বার্ণকেলি [Lord Chief Barankelly] ধর্মঘট সম্পর্কে বলেছেন: 'There is no autherity which gives a legal definition of the word 'Strikes'।'[২০] এ-সম্পর্কে গান্ধীজীর মত হলো যে 'ধর্মঘট' হোল সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় অনুষ্ঠিত এক সাময়িক ব্যাপার মাত্র।[২১]

ভারতের মুঘলযুগে অথবা মধ্যযুগের মুসলিম শাসনে ধর্মঘটের পরিপূরক শব্দ হিসাবে হরতালকেই স্বীকৃতি দেওয়া হতো। হরতাল শব্দটি মুসলিম শাসনের অধ্যায়ে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হলেও, হরতাল শব্দটি আসলে গুজরাঠী। অভিধানকার 'হরতাল' শব্দটির অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে বলছেন ফারসী 'হর' শব্দের সঙ্গে গুজরাঠী 'তালু' শব্দ যুক্ত হয়ে হরতাল শব্দটি তৈরী হয়েছে। এর অর্থ 'হর' অর্থাৎ প্রত্যেক এবং 'তালু' অর্থে কুলুপ—প্রত্যেক দোকানে কুলুপ বা বন্ধ করা, হাটে বাজারে বেচা-কেনা বন্ধ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[২২] 'বন্ধ' শব্দটিও বেশ প্রচলিত। মুসলমান শাসন ব্যবস্থায় 'হরতাল' প্রতিবাদের স্বাভাবিক মাধ্যম হিসাবে গণ্য হওয়া সত্ত্বেও,

হরতাল করার কোন বিধানই ইসলামী শরিয়তে নেই। ইসলামী দর্শনে বলা হয়েছে 'হরতাল' অমুসলমান প্রবর্তিত একটি অনুষ্ঠান মাত্র। হরতালে নাকি গরীবদের উপর ভীষণ জুলুম করা হয় এবং এর দ্বারা দুষ্ট লোকে নানা অন্যায়ও অত্যাচার করার সুযোগ পায়।[২৩]

: ধর্মঘটের বিভিন্ন প্রকৃতি :

স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কোন বিশেষ যুক্তি বা পদ্ধতি একটি বিশেষ ঐতিহ্যে স্থিত থাকতে পারে না। বরং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে কোন যুক্তি বা পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। এবং এটাই নিয়ম। তবে আবেদন সবক্ষেত্রে সমান থাকে না, কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা বা ব্যবহার-বিধি সব যুগে এক থাকে। এখানে স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে চেতনা ও চিন্তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সেকাল কিংবা একালে সমাজকে একই ভাবে নাড়া দিয়ে থাকে। তবে প্রাচীন ধর্মঘটের প্রকৃতির সঙ্গে বিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধর্মঘটেরও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে কৌশলগত দিকের পরিবর্তন সব সময়েই পাল্টাতে পারে। একটি বিশেষ কৌশলকে কেউ চিরদিন আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে না। তাই ধর্মঘটের ক্ষেত্রেও কৌশলগত পদ্ধতির বিবর্তন ঘটতে দেখা গেছে। বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মঘটের মূল যে জঙ্গী মনোভাব তা বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। এ-ছাড়াছ, শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতেরা কিভাবে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় গর্জে উঠেছে। সামগ্রিক ভাবে, কি কুটির শিল্পে, কি বৃহৎ শিল্পে উপার্জক শ্রেণী গ্রামীণ অর্থ-নীতিকে পুষ্ট করে তুলতে একতা ও সংহতির বড়ো ও জোরদার হাতিয়ার ধর্মঘটের বিভিন্ন কৌশলগুলিকে কাজে লাগিয়ে, যে কোন অন্যায় অত্যাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পেরেছে। সাধারণ ধর্মঘট বা হরতালগুলির ক্ষেত্রে একটি সাধারণ চিন্তা ও চেতনা প্রসারিত হয় ঠিকই, কিন্তু যে কোন বিষয়ের প্রতিবাদ, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অন্যান্য কৌশলগত ধর্মঘটের মতো এতো বেশী অচলাবস্থা ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। ভারতের ধর্মঘটের ইতিহাসে 'অবস্থান ধর্মঘট', 'অনশন ধর্মঘট', 'প্রতীক ধর্মঘট', ও 'কলম ধর্মঘট' আধুনিককালে মারাত্মক অস্ত্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। বর্তমান কালে ধর্মঘটগুলির প্রকৃতি ও তথাকথিত ধ্যান ধারণা বদলে গিয়েছে। এবং যে কোন সংহতির ক্ষেত্রে এগুলি সবচেয়ে জোরদার ভিত্তি। বিশেষ করে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে চিড় ধরাতে

এবং শ্রমিক শ্রেণীর শান্তি, স্বাধীনতা ও প্রগতির চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির ধর্মঘটগুলির বিকল্প কোন পন্থা নেই এবং এই অস্ত্র শোষকের ধারণাকে বদলে দিতে অদ্বিতীয়। ধর্মঘটের বিভিন্ন কৌশলগুলি মানুষের বাঁচার চাহিদাকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করে তা ধর্মঘটগুলির ইতিহাস আলোচনা করলেই প্রমাণ হবে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই সব ধর্মঘটের উৎস বেশ প্রাচীন। যা কালের বদলে কেবল মাত্র চরিত্রের দিক থেকে অন্যরকম বৈশিষ্ট্যে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে চেষ্টা করছে। তাই একালের ধর্মঘটগুলির কৌশলগত প্রকৃতি প্রাচীনকালেরই অনুবর্তন মাত্র। যা মেজে ঘসে যুগ ও জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ঃ অবস্থান ধর্মঘট ঃ

'অবস্থান ধর্মঘট' এক ধরণের ধর্মঘট। আধুনিক কালে এই ধর্মঘট আকচারই ঘটে। কিন্তু এই ধর্মঘটের প্রকৃতি এ কালের কোন পরিচয় বহন করে না। বরং প্রাচীন ইতিহাসের দিক থেকে এর উৎসক্ষেত্রটি বেশ কৌতূহলের। বাল্মীকি রামায়ণের মধ্যে ভারতে অবস্থান ধর্মঘটের প্রকৃত পরিচয় আছে।[২৪] রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একটি ঘটনা সূত্র থেকেই 'অবস্থান ধর্মঘট'টির প্রাচীন ইতিহাসের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়।

আমরা জানি, রামরাজত্ব সুখের রাজত্ব। সে জন্যেই হয়তো শোনা যায় সে রামও নেই, সে রাজত্ব নেই। এমন সুখের রাজ্যেও প্রজার ক্ষোভ ধূমায়িত হয়েছিল। কিন্তু কেন? কারণ আর কিছুই নয়। ঘটনাটি সামান্য মাত্র। কিন্তু ঘটনাটি যে সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত দেয়, সে সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না।

ঘটনাটির পরিচয় মেলে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের শম্বুকের শিরচ্ছেদ অংশে। একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রজার পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের মৃত্যু হলে, তিনি রামের রাজসভায় সুবিচারের আশায় আসেন। ব্রাহ্মণ পুত্রের মৃত্যু-দুঃখে কাতর হয়ে বারংবার হা পুত্র! হা পুত্র! বলে রোদন করতে থাকেন। বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে বলেন, হায়! আমি পূর্ব জন্মে কি দুষ্কর্ম করেছিলাম। যার ফলে আমি আমার একমাত্র পুত্রকে হারালাম। হা বৎস! তুমি অপ্রাপ্ত যৌবনে আমাকে ফেলে অকালে কোথায় চলে গেলে, আমি ও তোমার জননী আমরা উভয়েই তোমার শোকে অল্প দিনের মধ্যেই দেহত্যাগ করব। আমি যে কখনও মিথ্যা বলেছি, কি কখনও কারো অনিষ্ট করেছি

বলে মনে হয় না। হায়! আজ কোন দুষ্কর্মের ফলে আমার এই বালক পুত্র পিতৃকার্য না করেই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হোল। রাজা রামের রাজ্যে কারও যে অসময়ে মৃত্যু হয় আমি এ কখন দেখিনি বা শুনিনি। কিন্তু যখন তাঁর রাজ্যে বালকের মৃত্যু হোল তখন নিঃসন্দেহে তাঁরই কোন কুতকর্ম বা ঘোর পাপ আছে। রাম! এই বালক কাল গ্রাসে পতিত, তুমি একে জীবিত কর। আমি আজ ভার্যার সঙ্গে অনাথের ন্যায় এই রাজদ্বারে প্রাণ-ত্যাগ করব। রাম! আমরা এ যাবৎ কাল পর্যন্ত তোমার রাজ্যে সুখে ছিলাম কিন্তু এখন আমরা মৃত্যুর বশবর্তী সুতরাং তোমার রাজ্যে আমাদের সামান্যই সুখ। মহাত্মা ইক্ষাকুর এই রাজ্য নিশ্চয় অরাজক। প্রজারা রাজার দোষেই নষ্ট হয়ে থাকে। রাজা অসচ্চরিত্র হলে প্রজার অকালে মৃত্যু ঘটে। অথবা বোধ হয়, গ্রাম ও নগরের অধিবাসীরা নানা রূপ পাপ আচবণ করছে এবং সেই সমস্ত পাপের যথোচিত প্রতিবিধান হচ্ছে না। তাও নিশ্চয় রাজদোষ। সেই রাজদোষেই আজ আমার এই বালক বিনষ্ট হয়েছে। জনপদবাসী ব্রাহ্মণ এইরূপ বাক্যে বারংবার রামকে ভৎর্সনা করে দুঃখিত মনে মৃত-বালককে নিয়ে রাজ দ্বারে ধর্ণা দিতে লাগলেন।[২৫] বলাই বাহুল্য ব্রাহ্মণের এই ধর্ণা বা অবস্থান করার ঘটনা থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় সে সেকালেও কোন কিছুর প্রতিকার বা প্রতিবিধান কল্পে রাজদ্বারে ধর্ণা দেওয়া বা অবস্থান করা একটি বিশেষ প্রথা বা কৌশল হিসেবেই গৃহীত হয়েছিল। এই ধর্ণা বা অবস্থানের দ্বারা অবশ্য রাজা কিংবা প্রজার সম্পর্ক কখনও তিক্ত হয়নি। বরং সম্পর্ক আরো সরল ছিল বলতেই হয়। ধর্ণা বা অবস্থানের ভিতরে প্রজা তার দাবি-দাওয়া উত্থাপিত করতে পারতো। এ ক্ষেত্রে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণের রাজ-দ্বারে অবস্থান বা ধর্ণাকে মেনে নিয়ে, যথার্থ বিচারের আশ্বাস বৃদ্ধকে দিয়েছিলেন। যথাসময়ে তার বিচারও করেছিলেন।

মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসে রাজার সঙ্গে প্রজার ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। এ সম্পর্কে সেকালের কাব্যগ্রন্থগুলিতে ছড়িয়ে আছে বহু দৃষ্টান্ত। যেমন ১৭১১ সনে রচিত ঘনরাম রচিত 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের মধ্যে মেলে। রায় লাউসেন গৌড় রাজের কাছে সরাসরি তাঁর আর্জি পেশ করেছেন। এ-ক্ষেত্রে প্রজার সঙ্গে রাজার সরল সম্পর্ক কতখানি হৃদ্য ছিল তা ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গলকাব্যে'র কয়েকটি চরণেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে :

এত বলে গেলা গুরু রাজ সন্নিধান।
কও কেন এলে পুনঃ ভূপতি সুধান॥
সেন বলে আজ্ঞা কর ডোম তের ঘর।
লোকজন চাই যদি রাখিতে চাকর।
দিনু দিনু বলি রাজা দিল লিপিদান।
বিদায় হইল পুনঃ হইয়া নতমান।[২৬]

সেকালে প্রজার অভাব-অভিযোগ রাজদ্বারে উপস্থাপিত করতে পারলে কোন দাবি বিফল হোত না। তবে অনেক সময়েই তার সহজ সুযোগ ছিল না। গুরু অর্জুন রায়তদের অভাব নিয়ে সম্রাটের কাছে দরবার করছেন। অভাব-অভিযোগ নিয়ে সম্রাটের কাছে এই ভাবে আর্জি করা এবং সেই আর্জি মঞ্জুর করায় মুঘল শাসকের সঙ্গে কৃষকের যোগাযোগ ও নির্ভরতার ভাব সূচিত করে।[২৭] এ প্রসঙ্গে রাজা বা সম্রাটের কাছে ধর্ণা বা অবস্থান করার ভিতরে রাজা কিংবা প্রজার উভয়েরই স্বার্থ-চেতনা আচ্ছন্ন থেকেছে। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে প্রতিরোধ বা প্রতিবাদের ক্ষেত্রে রাজ দরবারে অবস্থান করা সেকালের পক্ষে একটি সাধারণ ঘটনা ছিল। তবে প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়া এবং তার বিভিন্ন রূপ কার্য কারণে ভিন্ন ভাবেই প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। যৌথভাবে আলাপ-আলোচনা করে রাজার বা সম্রাটের কাছে যে কোন বিষয় সম্পর্কে তাঁদের ন্যায়তঃ দাবিগুলি উত্থাপন করতে পারতো। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের সমবেত আবেদন কিংবা আর্জি রাজ দরবারে অবস্থানের মধ্যে দিয়েই সফল হয়েছে। 'জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শরণ থেকে প্রাপ্ত একটি ফর্মানে বলা হয়েছে যে, নারায়ণ ও ভাওয়াল নামে দু-জন জেলে পুকুর থেকে মাছ ধরত এবং সেই অধিকার তাদের বংশানুক্রমিক ছিল। কিন্তু জায়গীরদারের আমলারা তাদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করছে। জাহাঙ্গীর এই রকম আচরণের বিরুদ্ধে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং দু-জন জেলের আবেদন মঞ্জুর করে তাদের বংশানুক্রমিক অধিকারকে স্বীকার করেন।'[২৮] জেলেদের রাজ-দরবারে আবেদন যে গ্রাহ্য হয়েছে তাও সেই রাজদরবারের ধর্ণা বা অবস্থান করার ফলে। অবস্থান করার ঘটনা যে সেই রামচন্দ্রের স্বর্ণযুগ থেকেই অনুসৃত হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই অবস্থান করার পদ্ধতি তো একালেরই অবস্থান ধর্মঘটের একটি পুরাতন সংস্করণ মাত্র। '১৮১৬ সালে মারাঠা আমলে আমেদাবাদের মারাঠা শাসক ও অত্যাচারী সংবাদ সংগ্রাহকদের

বিরুদ্ধে বানিয়া ও ব্যবসায়ীরা দিনরাত ধর্ণা দিয়েছিল।'[২৯]এই ধর্ণা দেওয়া বা অবস্থান করা থেকে অবস্থান ধর্মঘটের প্রকৃতি উপলব্ধি করার কোন অসুবিধা নেই। বরং এই অবস্থানের সঙ্গে ধর্মঘটের স্বরূপটি যুক্ত হলে একালের 'অবস্থান ধর্মঘটের' তাৎপর্যটি কাল-বদলে যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এযুগের এই ধর্মঘটের যথার্থ অভিধা হোল যে শ্রমিক সম্প্রদায় কর্মস্থলে এবং অন্যান্য প্রতি-বাদের জায়গায় দিনের পর দিন বসে থেকে সে ধর্মঘট পালন করেন তাই 'অবস্থান ধর্মঘট'।

: অনশন ধর্মঘট :

'অবস্থান ধর্মঘট' ব্যতীত 'অনশন ধর্মঘট' [Hunger strike] আর এক প্রকৃতির ধর্মঘট। যা কারও কার্যের নৈতিক প্রতিবাদ স্বরূপ অনশন অবলম্বন করে ধর্মঘট পালিত হয়, তাকেই সাধারণ ভাবে অনশন ধর্মঘট বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই ধর্মঘটের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'অনশন দ্বারা ধর্মঘট' অবস্থান ধর্মঘটের ন্যায় অনশন ধর্মঘটেরও ইতিহাস সুপ্রাচীন।

সত্যিই অনশন প্রথা অতি প্রাচীন। প্রাচীন ভারতে এর প্রচলন ছিল। অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদের স্বাভাবিক মাধ্যম হিসাবে অনশন করা একটি সামাজিক প্রথা বা রীতি ছিল বলে জানা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির সামাজিক রীতি-নীতিতেও অনশন করার বিধান প্রচলিত ছিল। কোন কিছু কামনা-বাসনা পূরণার্থে অনশন করে হত্যো-দেওয়ার প্রথাও সুবিদিত ও সু-প্রাচীন। তাই মনুসংহিতায় বলা হয়েছে 'প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য উত্তমর্ণগণ অধমর্ণের দ্বারে হত্যা দিয়ে থাকেন।'

বিভিন্ন ধর্মেও অনশনব্রত পালন একটি পবিত্র কর্ম হিসাবে বিবেচিত। যা পালনে বিশ্বের বহু মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন। যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং অনশন করেছিলেন এবং অনুগামীদেরও ধর্মের অঙ্গ হিসাবে অনশন করার নির্দেশ দান করেছিলেন। জৈন ধর্মে অনশন ব্রত পালনের কথা প্রচলিত আছে। জৈনদের মতে অনশন প্রত্যেক ধর্মকার্যের অঙ্গ। হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে বিশেষ করে অগ্নি পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, বশিষ্ট সংহিতা, বিষ্ণু সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে অনশন পালনের কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। চীনদেশে 'তাও ধর্মে' অনশনকে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে। ইহুদিরা ও মহাযান বৌদ্ধরাও অনশনের

অনুগামী।[৩০] কিন্তু ধর্মের ইতিহাসে অনশনের ব্যাপক নিদর্শন থাকলেও ধর্মের অনুশাসনের মধ্যে অনশন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অনশন বহু ক্ষেত্রে অবিচার-অন্যায় ও শোষণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবেও গণ্য হয়েছে। এমন কি রাজনীতির সঙ্গে এর যোগসূত্র কোথায় যেন কিভাবে থেকে গেছে। তাই কোন রাজনৈতিক আপোষ মীমাংসার জন্যে যেমন ধর্মঘট পালন করা হয়ে থাকে, তেমনি—এই ধর্মঘটের সঙ্গে 'অনশন-ব্রতটুকু জুড়ে দিয়ে, ধর্মঘটের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন যেন আরো দৃঢ় ও অঙ্গিকারবদ্ধ হয়ে উঠে। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিনিধিরা অনশনব্রতকে একটি অস্ত্র হিসাবে অর্থাৎ ধর্মঘট আন্দোলনের একটি কৌশল হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনও করেছে। এক কথায় অনশনব্রতকে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে কোন কিছুর প্রতিকার কল্পে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অতএব যে প্রক্রিয়ায় অনশনের ভিতর দিয়ে ধর্মঘট পালিত হয়, তাকে আমরা নীতিগত ভাবে 'অনশন ধর্মঘট', হিসাবে মেনে নিয়েছি। যদিও অনশন প্রসঙ্গে গান্ধীজীর বক্তব্য ভিন্নমুখী, তিনি বলেছেন, 'শেষ কারণ হিসাবে অনশনই একমাত্র কাম্য।'[৩১] অথচ 'অনশন ধর্মঘট' রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য দাবি আদায়ের জন্যেই বিশেষ ভাবে গৃহীত হয়ে আসছে। গান্ধীজী—অনশনের ক্ষেত্রে—ন্যায় বিচার পাবার অন্যসব পন্থা ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও সাফল্য পাওয়া যায়নি, কেবল তখনই একমাত্র শেষ অস্ত্র হিসাবে সত্যাগ্রাহীকে অনশন পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে 'নিজের বেতন বৃদ্ধি জাতীয় ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অনশন করা অনুচিত। কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজেদের গোষ্ঠীর বেতন বৃদ্ধির জন্য অনশন করা চলতে পারে।'[৩২] অনশন ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পরবর্তীকালের রাজনীতিতে কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, তা কম বেশী সবারই জানা আছে। 'অনশন ধর্মঘট' কেবল মাত্র আত্মত্যাগের অঙ্গীকার হতে পারে না। 'অনশন ধর্মঘট' আত্মঅধিকারেরও একটি বিশেষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ অনশনের ভিতর দিয়ে 'চাপসৃষ্টি' করে অনেক অশুভ শক্তি বা আঁতাতের বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হওয়া যায়, তেমনি কোনকিছু আদায় বা প্রতিকারের আবেদনও বিফলে যায় না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাই 'অনশন ধর্মঘট'কে একটি সফল প্রক্রিয়া বা কৌশল বলা যেতে পারে। স্থান-

কাল-পাত্র ভেদে অনশন ধর্মঘটের ভিতর দিয়ে মানুষ তার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার সামগ্রিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে সচেষ্ট থেকেছে। এবং আজও অনশন ধর্মঘটের মৌল আবেদন যে কোন মানুষকে বৃহত্তর সংগ্রামের দিকে পরিচালিত করে। দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা অর্জনে বা রক্ষায় অনশনব্রত একটি বড় দৃষ্টান্ত ছিল। শহীদ যতীন দাসের মৃত্যু অনশনের জন্যে হয়েছিল। তাই অনশন ধর্মঘটকে জনযুদ্ধের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার বলতে দ্বিধা থাকে না।

অবস্থান, অনশন ধর্মঘট ব্যতীত প্রতীক ধর্মঘট, কলম ধর্মঘট, ও লাগাতার ধর্মঘটের প্রকৃতিগুলিও প্রায় একই বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রত্যেকটি ধর্মঘটের শক্তি কোন না কোন ভাবে অত্যাচারের প্রতিরোধ বা প্রতিকার করতে সর্বহারা মানুষকে সাহায্য করেছে। নিপীড়িত জনগণের অধিকার রক্ষার বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের ধর্মঘটের প্রেরণা জনমত সংগঠনে ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন-গুলিকে পরিপুষ্ট করে তুলতে যে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটিয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

ধর্মঘটের আন্ত'র্জাতিক ব্যাখ্যা ঃ

ভারতীয় শব্দকোষে ধর্মঘটের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা বুঝতে আমাদের তেমন কোন অসুবিধা হয় না। বিদেশী অভিধানে 'ধর্মঘটের' ব্যাপারটি কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা জানা যেতে পারে। বিদেশে ধর্মঘটের স্বরূপ সম্পর্কে কে কি বলছেন তা একবার দেখে নেওয়া যাক। অক্সফোর্ড অভিধানে বলা হয়েছে : 'a concerted refusal to work by employees till some grievance is remedied. So the wrod 'Strik' may be best defined as a sudden cessation of work resulting from an agreement on the part of a body of workmen either to break or not to renew their existing contract of service for the purpose of obtaining or resisting a change in the conditions of employment. So the strikes is not a mere refusal to work, for such an act has never been made punishable by law, nor is it the abandonment of work begun, for the right to repudiate exists in the case of labour contracts just as in that of any other contract that is not for a fixed term. The strike is a means of constraint exercised by one contracting party over the other in order to obtain certain modification of the contract. In the case of strike the condition consists in the sudden interruption of labour and injury which results for the employer. It should be noted, also, that though a strike may be accompanied by breaches of contract and intimidation and riot, yet such features as these, though common to many strikes, are excluded from the legal definition of the word strike."[১]

আবার Encyclopaedia Britannica তে বলা হয়েছে: 'Work stoppages resulting from serious disagreements between labour and management. Strike are collective refusals by employees to work under the conditions required by employers.······Strikes arise for

a number of a reasons ; from disputs about wages and the conditions of employment ; in sympathy with other striking workers ; from jurisdiction disputes between two unions ; or for purely political goals [as in the general strike q. v.] strikes not authorized by the central union body [wildcat strike,] may be directed against the union leadership as well as the employer.

"The right to strike is granted in principle to workers in nearly all industrial countries although some require a series of specified efforts at settlement preceding the strike and others forbid purely political strikes and strikes by public employees. The types and purposes of strikes and their frequency depend on a great variety of factors, including a country s political system, its history, and the role of the trade unions.

"Most strikes and threats of strikes are intended to inflict a cost on the employer for failure to meet specific wage and other demands of the unions. Among Japanese unions on the other hand, strikes are not intended to halt production for long periods of time and are more akin to demonstrations. Occasionally, as in some Western. European countries strikes have been politically motivated, stemming from a general class consciousness among the workers. . In countries ruled by governments with a strong socialist orientation, strikes may be directed against the governments and their policies"[২]

বিদেশী অভিধানে ধর্মঘটের ব্যাখ্যায় পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকারের প্রসঙ্গটিই বড় করে দেখা হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে ধর্মঘট একটি অধিকার অর্জনের কৌশল ও মালিকের বিরুদ্ধে 'ধর্মঘট' একটি সংগ্রামী অস্ত্রও বটে। যার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণী তাঁদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে পারেন। মালিকের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীকে সংঘাতে যেতে হলে যে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির প্রয়োজন, তার জন্যে চাই সংহতি। প্রতিরোধ ব্যতীত কোনদিনই শ্রমিক তার ন্যায্য অধিকার অর্জন করতে পারে না।

তাই সংগ্রাম বা লড়াই হলো শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র মুক্তির পথ। শ্রমিক তার সার্বিক মুক্তির জন্যে তার উৎপাদন যন্ত্রের মালিক হওয়া ছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই।[৩] এই চেতনা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একদিনে বা আপনা আপনি আসেনি।

লেনিন নিজের দেশের শ্রমজীবীদের সংগঠিত করতে গিয়ে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন: "শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের ক্ষেত্রে ধর্মঘটগুলির অথবা কাজ বন্ধের তাৎপর্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ধর্মঘটগুলিকে একটা পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিতে দেখা দরকার। আমরা দেখেছি, মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করে মজুরি নির্ধারিত হয়। এই অবস্থায় একজন শ্রমিক যখন নিজেকে এককভাবে অত্যন্ত অসহায় মনে করে, তখন শ্রমিকদের পক্ষে যুক্তভাবে সংগ্রাম করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। মালিক যাতে মজুরি হ্রাস করতে না পারে, অথবা যাতে মজুরি বৃদ্ধি করা যায় তার জন্যই শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে বাধ্য হন। এবং এটা ঘটনা যে প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশেই শ্রমিকদের ধর্মঘট করতেই হয়। ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রত্যেকটি দেশেই এবং সর্বক্ষেত্রেই শ্রমিকরা নিজেদের অসহায় মনে করে, যখন তারা বিচ্ছিন্ন থাকে। একমাত্র ঐক্যবদ্ধভাবেই তারা মালিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে—হয় ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে অথবা ধর্মঘটের হুমকী প্রদর্শন করে। ধনতন্ত্রের অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় যখন অধিক সংখ্যায় বড় বড় কারখানা চালু হয় এবং বড় মালিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ছোট মালিকেরা দ্রুত কোণ ঠাসা হয়ে পড়ে, তখন শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগত জরুরী আকার ধারণ করে। কারণ, এই অবস্থায় বেকারী বৃদ্ধি পায়, পুঁজিপতিদের মধ্যে সস্তায় মাল উৎপাদনের [এবং সস্তায় উৎপাদনের জন্য তারা শ্রমিকদের মজুরি যথা সম্ভব কমিয়ে দেয়] প্রতিযোগিতা তীব্র হলে শিল্পজাত দ্রব্যের দামের ওঠানামা শুরু হয় ও সংকট তীব্র হয়। যখন শিল্পের প্রসার হয় তখন মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি পায় অথচ তারা সেই মুনাফার কোন অংশ শ্রমিকদের দেবার কথা চিন্তা করে না; কিন্তু যখন সংকট সৃষ্টি হয় তখন মালিকেরা ক্ষতির বোঝা শ্রমিকেরা ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়।......

"এভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকেই যে ধর্মঘটের উদ্ভব হয় সেই ধর্মঘট-গুলিই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সূচনা করে। একজন নিঃস্ব একক শ্রমিকের পক্ষে ধনবান পুঁজিপতিদের মুখোমুখি হওয়ার

অর্থই হচ্ছে চূড়ান্ত দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া। পুঁজিপতিদের কাছে কোন সম্পদেরই কোন মূল্য থাকে না যদি তাদের উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সামগ্রীর উপর শ্রমিকেরা তাদের শ্রম প্রয়োগ করে নতুন সম্পদ সৃষ্টি না করে। পুঁজিপতিদের কাছে একজন একক শ্রমিক নিতান্ত ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এই ক্রীতদাসের কাজেই হবে নিরবচ্ছিন্নভাবে মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি করে যাওয়া। এর বিনিময়ে সে পাবে মাত্র এক টুকরো রুটি, অথচ সারা জীবন ধরে শ্রমিককে থাকতে হবে অনুগত এবং ভাড়াটে ভৃত্য হিসেবে। কিন্তু যখন শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের দাবি পেশ করবে এবং পুঁজিপতিদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, একমাত্র তখনই তারা আর ক্রীতদাস থাকবে না—তারা মানুষ হিসাবে দাঁড়াতে পারবে, দাবি করতে পারবে; বলতে পারবে যে তাদের শ্রমের ফল দিয়ে একদল পরগাছার ধনবৃদ্ধি করা চলবে না; যারা শ্রম করছে তাদেরও মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে দিতে হবে। ক্রীতদাসেরা তখন নিজেরা প্রভু হওয়ার দাবি করতে পারবে। তারা দাবি করবে যে জমিদার ও পুঁজিপতিদের মর্জি অনুযায়ী তাদের জীবনের গতি নির্ধারিত হবে না। তাই ধর্মঘট সব সময়েই পুঁজিপতিদের মনে ভীতির সঞ্চার করে; কারণ, এর মধ্যে দিয়ে মালিকের আধিপত্য খর্ব হতে শুরু করে।

"শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে একজন জার্মান শ্রমিক গান বেঁধেছেন:'তোমায় বলিষ্ঠ বাহু যখন চাইবে, কারখানার চাকা বন্ধ হবে।' এবং বাস্তবে হয়ও তাই। কলকারখানা ভূস্বামীদের জমিজমা, যন্ত্রপাতি, রেলওয়ে ইত্যাদি সমস্ত কিছু যে সম্পদ উৎপাদন করে তার চালিকা শক্তি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী। যে শ্রমিক জমিতে লাঙল দেয়, খনি থেকে সম্পদ উদ্ধার করে, কারখানায় পণ্য উৎপাদন করে, ঘরবাড়ি, রেল-ওয়ার্কশপ নির্মাণ করে সেই শ্রমিক যদি কাজ বন্ধ করে দেয় তবে সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকটা ধর্মঘটই পুঁজিপতিদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রকৃত ক্ষমতাবান তারা নয়—প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী শ্রমিকরাই এবং আর অন্য দিকে প্রত্যেকটা ধর্মঘটই শ্রমিকদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের অবস্থা হতাশাজনক নয় এবং তারা এককও নয়। প্রত্যেকটা ধর্মঘটই সমাজতন্ত্রের এবং পুঁজির শোষণ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নটিকে শ্রমিকদের মনে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।"[৪]

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মঘটের ব্যাখ্যায় লেনিন পাশ্চাত্য দেশে সংঘটিত

ধর্মঘটগুলিরই কথা বলতে চেয়েছেন। মার্কস্ ও এঙ্গেলস ধর্মঘটকে শ্রমিক শ্রেণীর তাৎক্ষণিক ও অন্তিম লক্ষ্য সাধনের একটি শক্তিশালী এবং সংগ্রামী অস্ত্র হিসাবে বিবেচনা করতে চেয়েছেন। এঙ্গেলস আরও পরিষ্কার করে বলতে চেয়েছেন যে, ধর্মঘট হোল 'School of War'। তিনি আরও মনে করতেন যে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার অর্জন ও মুক্তির জন্য ধর্মঘটকেই বাধ্যতামূলক ও অপরিহার্য অস্ত্র হিসাবে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি লড়াই শেখার জন্যেও ধর্মঘটকে অত্যাবশ্যক বলেই মনে করতেন। কার্ল মার্কস্ তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 'ধর্মঘট'-কে সংগ্রামের এবং শ্রমিক শ্রেণীর সংহতির প্রশ্নে গুরুত্ব দিয়েছেন। যা দিয়ে শ্রমিকেরা তাঁদের লক্ষ্য অর্জনের, অধিকার প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন।

এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক গ্রন্থ সমূহেও ধর্মঘটের মূল উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা পাওয়া যায়। যেমন: Webb: *History of Trade Unionism*; Webb: *Industrial Democracy*; Ashley: *Economic History Vol I*; Cunningham: *Growth of English Industry and Commerces; Modern Time Part II*; Hobson: *Evolution of Modern Capitalism* প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্মঘটের উৎসকালের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা পাই। এ ছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রমিক শ্রেণীর রণকৌশল, তার সংগ্রামের পদ্ধতি বিশ্বজোড়া একতা ও রাজনৈতিক চেতনার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় ধর্মঘটের সাধারণ উৎসের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে দেখা যায়: 'Concerted movements of labour analogous to strikes are found in ancient times and in the mediaeval period and are as old as history itself. The annals of history are full of the innumerable rebellions of subject races, the slave insurrections, and semi servile peasant revolts. These forms of labour war, however, fall outside the scope of our subject because strikes in the modern acceptation of the term may be said to begin with the rise of capitalism and the differentiation between capital and labour in the 18th century.

'In the latter part of the 18th century the slowgoing methods of the handicraft stage were radically changed by the Industrial Revolution. It is true that even in the Middle Ages there was a

labour question, but then everything was on so much small a scale then that the difficulties of the situation were for more manageable and the personal intercorurse of masters and men was infinitely closer then that of the great modern employers and their hands....

'The labourers became incereasingly dissatisfied with a condition of dependance....They wished not only for higher wages but for emancipation from semi-patriarchal conditions. They demanded that wages shall not be settled once for all on the employers offer, but by a contract in which their own action shall play an effective part.'*

ধর্মঘট বা স্ট্রাইক-এর উৎসের যে পটভূমিকা আমরা ভারতবর্ষের ধর্মঘটের ক্ষেত্রে দেখেছি, আন্তর্জাতিক ধর্মঘট আন্দোলনের তা ক্ষেত্রে দেখি না। তার উৎসমুখের বৈশিষ্ট্যগুলি ভিন্নতর। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ধর্মঘটের ইতিহাস আন্তর্জাতিক ধর্মঘটের উৎসের ইতিহাসের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ধর্মঘটের আন্তর্জাতিক ব্যাখ্যাই ভারতবর্ষে শোষিত মানুষকে শান্তি সমাজতন্ত্রের ও প্রগতির দিকে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এছাড়া এই ধর্মঘট তাদের মধ্যে একতাবোধও এনে দিয়েছে।

৩.

ভারতের প্রথম ধর্মঘট কেন ?

ক।

ভারতের ধর্মঘটের আধুনিক কালের ইতিহাসে কলকাতার পাল্কি-বাহক-গণই ধর্মঘট পালনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সেকালে যানবাহনের ক্ষেত্রে পাল্কির কদর অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট ছিল। অন্তঃপুরের মহিলারা ঝালর ঢাকা পাল্কিতে চড়ে গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন প্রায়ই। পাল্কি বেয়ারারা ঘাটে নেমে পাল্কি সহ পুরনারীদের গঙ্গার পবিত্র জলে চুবিয়ে নিয়ে ফিরে আসতেন অন্দর মহলে। সেকালের সমাজচিত্রে পাল্কির কদর কেমন ছিল তা এ-থেকে অনেকখানি অনুমান করা যেতে পারে। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে পাল্কিই ছিল এ দেশের পরিবহনের একমাত্র অবলম্বন।

কলকাতার সর্বত্রই পাল্কি বেয়ারাদের চলাচল ছিল এবং সব জায়গা থেকেই তা পাওয়াও যেত। বিশেষ বিশেষ জায়গায় পাল্কির আড্ডা বা পাল্কি স্ট্যাণ্ডও ছিল, একালের বাস স্ট্যাণ্ডের মতোই। এদেশে বিদেশীদের আগমন ঘটতো জাহাজ থেকে নেমে—ওড়িয়া বেয়ারাদের কাঁধে চড়েই। এ-ছাড়া সেকালের বেশীর ভাগ সাহেবই পাল্কিতে চড়েই স্কুল-কলেজ-অফিস-কাছারিতে যাতায়াত করতেন। হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়ার জন্যে কত ছাত্রই না হেয়ারের পাল্কির পিছনে পিছনে মাইলের পর মাইল ছুটেছেন।[১] ব্যক্তিগত পাল্কি ছাড়াও সরকারী পোষ্ট অফিসের নিয়ন্ত্রণেও পাল্কি চলাচলের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল। সে-সব পাল্কি পরিচিত ছিল ডাক-চৌকি নামে। পাল্কির বেয়ারাদের ডাক-চৌকিতে থাকার জন্যেও ব্যবস্থা ছিল উত্তম। দূরবর্তী কোন জায়গায় যেতে হলে ডাক-চৌকিই একটা সুবিধা জনক ব্যবস্থা। ডাক-চৌকির সাহায্যেই দেশের বিত্তশালী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দূর দেশে যাতায়াতের সুযোগ নিতেন।

ডাক-চৌকির মোটামুটি একটা ভাড়ার হার জানা যায় ৬ই জানুয়ারীর ১৭৮৫ সালের কলকাতা গেজেটের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি থেকে। কলকাতা থেকে বিভিন্ন জায়গার পথের দূরত্ব অনুযায়ী ভাড়া নির্ধারিত হতো। এই ভাড়া একালের হিসেবে প্রথম শ্রেণীর ট্রেনে চড়ার চেয়েও বেশী বললে ভুল হবে না। পথের দূরত্ব এবং খাওয়া-দাওয়ার হিসেব নিকেশ ও পাল্কির ভাড়া,

সেকালের বাজার দরের পক্ষে কম বিলাসবহুল ছিল না। এ-প্রসঙ্গে কলকাতা থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নির্ধারিত পাল্কির ভাড়ার তালিকাটি এক নজরে দেখে নেওয়া যেতে পারে :[২]

চন্দননগর	...	২৪॥০	মুরদাবাদ	...	১৫৯॥০
চুঁচুড়া	...	২৪॥০	রাজমহল	...	২৫৭॥০
হুগলী	...	৪৬।০	ভাগলপুর	...	৩৫৪॥০
বাঁশবেড়ে	...	৭৬ টাকা	মুঙ্গের	...	৪০৬।০
বহরমপুর	...	১৫৯॥০	পাটনা	...	৫৪০ টাকা
কালকাপুর	...	১৫৯॥০	বাঁকিপুর	...	৫৭০ টাকা
ময়দাপুর	...	১৫৯॥০	দানাপুর	...	৫৫৩॥০
কাশিমবাজার	...	১৫৯॥০	বক্সার	...	৬৬৪ টাকা
মুর্শিদাবাদ	...	১৫৯॥০	বেনারস	...	'৬৪ টাকা

কলকাতার বাইরে গেলে ডাক-চৌকির নির্দিষ্ট ভাড়ার মতো কলকাতার ভিতরেও ঠিকে পাল্কির ভাডার হারও ছিল নির্দিষ্ট। ১৭৯৪ সালের বেয়ারা-দের মজুরী সেদিনের মূল্যস্তরের তুলনায় ছিল ভালোই। পাঁচ জন ঠিকে বেয়ারার জন্যে একদিনের ভাড়া ছিল মাত্র একটাকা। অর্ধদিবসের জন্যে আট আনা। কলকাতার বাইরে পাঁচ মাইল পর্যন্ত যেতে পাল্কির ভাড়া চার আনা হিসাবে দিতে হয়েছে। এক ঘণ্টার কম সময়ের জন্য এক আনা ভাড়া যাত্রী সাধারণকে গুণতে হবে।[৩]এই দাম থাকা সত্ত্বেও কিন্তু পাল্কিতে চড়া সবার পক্ষে সম্ভব হতো না। দু-আনা বা চার আনা পয়সার মূল্য সেকালের পক্ষে অনেক বেশীই ছিল। কারণ তখন সামান্য দু-এক কড়ি দিয়েই চলে যেত দিনমজুরের সংসার। সেকালের বাজারদরের একটু নমুনা থেকেই বোঝা যাবে যে ঐ দর অনুপাতে পাল্কি বেয়ারাদের মজুরী খুব একটা কম ছিল কিনা। ১৮০০ সালের শ্রীরামপুরের বাজার দরের হিসাব থেকে সহজেই ধারণা করা যাবে যে সেকালের শ্রমজীবী মানুষের জীবন যাপনের মানের সঙ্গে মজুরীর তারতম্য কতটা ছিল। ১৮০০ সালের ভোগ্য-পণ্যসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বাজার দর ছিল এই রকম :[৪]

পণ্যদ্রব্য	পরিমাণ	দর টা-আ-প
চাল	১মণ	১-১২-০

ডাল	১মণ	৩-১২-০
সঃ তেল	”	৩-৪-০
ঘি	”	১৮-২-০
নুন	”	২-৮-০
ময়দা	”	২-৮-০
মাখন	”	৩৬-০-০
গুড়	”	১-১৪-০
দুধ	”	১-১৪-০
মাছ	”	২-৮-০
মাংস	”	১০-০-০
মুর্গী	১০০টা	৭-১৩-০
আলু	১মণ	২-০-০
পিঁয়াজ	”	১-০-০
বেগুন	”	০-১৫-০
লাউ	১০০টা	১-৯-০
কলা	”	০-৪-০
ডিম	”	০-১০-০
চিনি	১মণ	৬-০-০
বিস্কুট	১ পাউণ্ড	০-২-০
ইঁট	১,০০০	১-১১-০
চুণ	১ মণ	০-৬-৬
বাঁশ	১০০টা	১০-০-০
রাজমিস্ত্রি	১ রোজ	০-৩-০
ধোপা	১০০ কাপড়	১-৮-০
নাপিত	১ সপ্তাহ	০-২-০
মুটে	১ মোট	১-৪-০
নৌকাভাড়া	শ্রীরামপুর থেকে কলকাতা	১-৪-০

১৮০০ সালের ঐ বাজারদরের তুলনায় সেদিনের একজন শ্রমিকের খুব একটা মন্দ রকম মজুরী ছিল না। মেহনত বা শ্রমের বিনিময়ে যিনি যেমন

পেরেছেন তেমনই উপার্জন করার চেষ্টা করেছেন। স্বাধীন জীবিকার ক্ষেত্রে এটাই ছিল নিয়ম।

১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার রাজা রামমোহনের কাছ থেকে ভারতীয় জনগণের আর্থিক অবস্থার কথা জানতে চাইলে, রামমোহন এ দেশের শ্রমিক ও কৃষকের মজুরীর হারের যে চিত্রটি উপস্থাপিত করেন তা থেকে ভারতের মজুরী-বিন্যাস যে কি ধরণের ছিল তা জানা যায়: 'কলকাতায় ছুতোর ও কামার ইত্যাদির মধ্যে ভাল কারিগররা…মাসে ১০ টাকা থেকে ১২ টাকা মজুরী পায় [অর্থাৎ ২০ শিলিং থেকে ২৪ শিলিং] সাধারণ কারিগর যারা একটু নিম্ন মানের কাজ করে তারা মাসে ৫ টাকা থেকে ৬ টাকা মজুরী পায় [অর্থাৎ প্রায় ১০ শিলিং] রাজমিস্ত্রিরা মাসে ৫ টাকা থেকে ৭ টাকা [অর্থাৎ ১০ শিলিং থেকে ১৪ শিলিং] পায়; সাধারণ শ্রমিকরা পায় মাসে সাড়ে ৩ টাকা থেকে ৪ টাকা, মালী বা হাল কর্ষকরা পায় মাসে ৪ টাকার মতো এবং পাল্কি বাহকরাও ঐ রকম মজুরিই পায়। ছোট ছোট শহরে এই মজুরির হার আরও কিছু কম এবং গ্রামাঞ্চলে তা আরও অনেক কম।'[৫] শহর ও গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতির ফারাক থাকায়, শহর অঞ্চলের জীবন যাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য একটু বেশীই ছিল। ফলে, সেকালের মূল্যস্তরের তুলনায় পাল্কি বেয়ারাদের খুব একটা নিম্ন মানের জীবন যাপন করতে হয়নি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সেদিনের ওড়িয়া ও বিহারী বেয়ারাদের জাতপাতের ব্যাপারটা প্রথম থেকেই সজীব ছিল। দেশীয় বেয়ারারা ছিলেন সাধারণতঃ নিম্নবর্ণভুক্ত মানুষ। কিন্তু বামুন কায়েতের ঘরের মেয়েদের ছুঁতমার্গিতার ফলে এ দেশের বেয়ারারা ছিল পরিত্যাজ্য। কালে-ভদ্রে যদিও বা কখনো নিরুপায় হয়ে বর্ণহিন্দুরা এদেশীয় বেয়ারাদের সাহায্য নিলে এমন নির্মমভাবে শুচিবাইগ্রস্ত হয়ে পড়তেন যে, আজকের দিনের বিচারে তা বড়ই মর্মপীড়াদায়ক মনে হবে। যেমন তাঁরা যে কাপড়ে পাল্কিতে চড়তেন সেই কাপড় পরিবর্তন না করে অন্দরে ঢুকতেন না; ঠাকুর বা রান্না ঘরে ঢোকার চিন্তা তো 'দূর অস্ত'।

নিজেদের শুচিতা রক্ষার জন্যে বাঙলার বাইরে থেকে প্রথম পাল্কি বেয়ারা আনিয়ে ছিলেন চন্দনগরের দেওয়ান রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। তিনি উড়িষ্যা থেকে গোপ জাতীয় কয়েকজন পাল্কি বেয়ারা নিয়ে আসেন। পরে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরও কলকাতায় উড়িষ্যা থেকে পাল্কি বেয়ারাদের এনে

নিজেদের আভিজাত্যের গরিমা প্রকাশ করেন।[৬] এই সব বেয়ারাদের কারো কারো মাস মাইনের ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায়। ওড়িয়া পাল্কি বেয়ারাদের ক্ষেত্রে পাঁচ টাকা এবং বিহারীদের ক্ষেত্রে চার টাকা মাসিক বেতনের হার নির্ধারিত ছিল। আগেই জানিয়েছি যে কলকাতার পাল্কি বেয়ারাদের রোজগার সেদিনের তুলনায় খুব একটা খারাপ ছিল না। তাই তাদের অর্থনৈতিক সংকট তত তীব্র হয়ে ওঠে নি। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই তাদের দিন কেটেছে। এমন সময় তাদের বাড়া ভাতে ছাই পড়লো। ব্রিটিশ শাসকের শোষণের কালো হাত, সরাসরি পাল্কি বেয়ারাদের পিশে ফেলতে চাইল।

১৮২৭ সালের ১২ই মে পাল্কি বেয়ারাদের ওপর সরকারী ভাবে প্রথম আঘাত আসে, সরকারের এক নয়া শাসন জারির ফলে। নতুন আইনে বলা হয় যে: ১. প্রত্যেক পাল্কি বেয়ারাদের পুলিশের খাতায় নাম লেখাতে হবে। ২. প্রত্যেক বেয়ারাকে পরতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে সংখ্যা নির্দেশক পিতলের চাকতি। ৩. ঘণ্টা অনুযায়ী মজুরী নির্দিষ্ট হলো। আইনের সব ধারাগুলিই বেয়ারাদের উত্তেজিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো। এই আইনের অপরাপর ধারার চেয়ে মজুরী কমিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাকে কেউ সহজে মেনে নিতে পারেনি। তাদের বিক্ষোভ ছিল যথেষ্ট যুক্তিসংগত ও ন্যায্য। আজকের দিনে ভাবতে অবাক লাগে যে, সেদিনের সেই অসংগঠিত শ্রমিক চেতনা হঠাৎ কিভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে সারা কলকাতার যানবাহনকে অচল করে দেয়। মানুষের এধরণের সংগঠিত আন্দোলন আমাদের দেশে প্রথম বলা যেতে পারে। এর আগে এমনটি আর দেখা যায়নি। এদেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার স্বরূপকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার মানসিকতা তখনও তৈরি হয়নি। অথচ সমকালীন ভারতবর্ষে বৃটিশ ঔপনিবেশিকবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনে কার্ল মার্কস গভীর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধি করে লিখেছিলেন: 'গোটা ১৮ শতক ধরে ভারত থেকে ইংলণ্ডে যে ধন প্রেরিত হয় তা অর্জিত হয়েছিল অপেক্ষাকৃত নগণ্য বাণিজ্যের দরুণ ততটা নয়, যতটা সে দেশের প্রত্যক্ষ শোষণের দরুণ এবং যে বিপুল ঐশ্বর্য জোর পূর্বক আদায় করে ইংলণ্ডে পাচার করা হয়েছিল তার দরুণ।'[৭] ১৮১৩ সালে ভারতে বাণিজ্য উন্মুক্ত হওয়ার কিছুকালের মধ্যেই তা তিনগুণেরও বেশী বেড়ে ওঠে। ব্রিটিশ শোষণ এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে নি; সেইসঙ্গে এদেশের মেহনতি শ্রমজীবীদের ওপর পরোক্ষ শোষণের মাত্রা বৃদ্ধির সুযোগ খুঁজেছে।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে তার প্রত্যক্ষ শোষণের লোভী হাতটি ধীরে ধীরে বাড়িয়েছে এবং সেই শোষণের প্রথম বলি হলো এদেশের পাল্কি-বাহক সমাজ। এর আগে এমন শোষণের দৃষ্টান্ত আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সরকারের এই শোষণনীতিকে পাল্কি বেয়ারারা কি নীরবে মেনে নেন ?

পরবর্তী উপ-পরিচ্ছেদে আমরা তার উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করবো!

খ। ভারতে প্রথম ধর্মঘটের ফল :

না, পাল্কি বেয়ারারা সরকারের নতুন আইনকে নত মস্তকে মেনে নেননি। প্রতিরোধে ও প্রতিবাদে তাঁরা মুখর হয়ে ওঠেন। ১৮২৭ সালে শ্রমিক শ্রেণীর উপর এইপ্রথম আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হল। ব্যাপারটিতে অবাক হবারই কথা। সেকালে তখনও পর্যন্ত এদেশে শ্রমজীবীদের স্বাধিকার রক্ষায় কোন গণসংগঠনেরই জন্ম হয় নি; এমন কি এবিষয়ে কোন পূর্ব ঐতিহ্যও নেই। তবুও পাল্কি বেয়ারাদের সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ গণ-বিদ্রোহে রূপান্তরিত হতে বেশী সময় নেয়নি। সরকারী নতুন কোন নিয়মের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে একটি সাধারণ সভা সেকালের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ১৮২৭ সালের মে মাসে এদেশের শ্রমজীবী মানুষ কলকাতার ময়দানে যে কর্মসূচী গ্রহণ করেন, তা যেন একালের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নিহারিকাপুঞ্জ।

ময়দানে অনুষ্ঠিত পাল্কি বেয়ারাদের সমাবেশের অপরাপর পেশায় নিযুক্ত শ্রমিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতি সংগ্রামী চেতনার একটি বলিষ্ঠ দিকের সন্ধান দেয়। সেদিনের ঐ সংগটিত শ্রমিক সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন সর্দার পাঁচু সুর নামে এক ব্যক্তি। যাঁর পরিচয় উদ্ধার শ্রমজীবী আন্দোলনের স্বার্থেই প্রয়োজন। এ-ছাড়াও সভার প্রধান বক্তা গঙ্গাহরি ছিলেন বেয়ারাদেরই একজন; যাঁর প্রদত্ত ভাষণে স্পষ্ট অনুভব করা গিয়েছিল সংগ্রামী ঐক্যের উত্তপ্ত ঝাঁঝ। তাঁর ভাষণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার মূল তাৎপর্যটিও ধরা পড়ে। নতুন আইন করে সরকার পাল্কী বেয়ারাদের মজুরী বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন। আর তারই বিরুদ্ধে যুক্তিগ্রাহ্য ভাষণের দ্বারা তিনি রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন : সরকারী

নয়া নীতিতে তাঁদের ক্ষতিই স্বীকার করতে হবে। এই অন্যায় জুলুম কখনও মেনে নেওয়া যায় না। এ আঘাত শ্রমজীবী মানুষের রুজি রোজগারের বিরুদ্ধে। ন্যায্য খাটুনীর বিনিময়ে নতুন আইন করে সরকার পাল্কি বেয়ারাদের মজুরী বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন। আর মোটা মজুরীর একটা অংশ সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে।[৮] এবং আজকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না পারলে, পরবর্তীকালে শোষণের আরও নতুন নতুন কায়দা সে প্রয়োগ করবে শ্রমজীবী মানুষদের ওপর।

পাল্কি বেয়ারাদের এই সাধারণ সভায় মাঝি, মাল্লা, গাড়োয়ান প্রমুখ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। মাঝি মাল্লাদের নেতা তিনকড়ি সেদিন তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণে ভাবীকালের ট্রেড ইউনিয়নের সম্ভাবনার উজ্জ্বল দিকটির কথাই ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। তিনি, শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়া কেবল পাল্কি বেয়ারাদেরই প্রয়োজন তা বলতে চান নি। তিনি সমগ্র শোষিত শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থেই এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা নেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। শোষকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্য অর্জনের একটি মাত্র পথ সংঘবদ্ধ আন্দোলন। শ্রমজীবী মানুষের শত্রু ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সমস্ত শোষিত শ্রেণীর একই মঞ্চ থেকে বৃহত্তর গণ-আন্দোলন গড়ে তোলাই হবে আগামী দিনের মুক্তির পথ। ১৮২৭ সালের মে মাসে পাল্কি বেয়ারাদের দাবির সমর্থনে সভাটি অনুষ্ঠিত হলেও, মাঝি মাল্লাদের নেতা হিসাবে তিনকড়ির রাজনৈতিক চেতনা ভাবীকালের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত করার পক্ষে ছিল প্রথম পদক্ষেপ।

ময়দানে অনুষ্ঠিত সভা ছাড়াও, সরকারের নতুন আইনের বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি হিসাবে পাল্কি বেয়ারারা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করার চিন্তা-ভাবনাও করেছেন।

পাল্কি-বেয়ারাদের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত নতুন আইনকে কাজে পরিণত করার জন্যে কর্তৃপক্ষ পুলিশকে সব রকম নির্দেশ দিয়েছিলেন। যার বিরুদ্ধে অমিত বিক্রমে রুখে দাঁড়ায় পাল্কি বেয়ারারা। পাড়ায় পাড়ায় গণসংগঠন, সভা-সমিতি, মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতে এবং বৃহত্তর আন্দোলনের প্রাক্-প্রস্তুতি হিসাবে গোটা পাল্কিবাহক সমাজ—শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অগ্র-বাহিনী শক্তি হিসেবে, 'ধর্মঘটের' মত অস্ত্র ব্যবহার করে মাথা তুলে দাঁড়াবার সৎ-সাহস অর্জন করে।

সরকারী হুঁশিয়ারী কাগজে বিজ্ঞাপিত হওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যেই হাজার হাজার পাল্কি বেয়ারা লাল বাজারের পুলিশ দপ্তরের সামনে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। মিছিলে বিক্ষোভে ও প্রতিবাদে সারা কলকাতার চেহারাই পাল্টে যায়। বোধ করি কলকাতার ইতিহাসে সংগঠিত বিক্ষোভ মিছিলের প্রথম নির্দশন তৈরি করা পাল্কি বেয়ারাদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। এ-ছাড়াও দেশের সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে একটি ন্যূনতম কর্ম-সূচীর ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সংবিধান রচনার প্রয়াসও পবিলক্ষিত হয়ে ওঠে, যে সংবিধান হচ্ছে শ্রমিক সংগ্রামের সনদ। এই সনদের সাংবিধানিক শর্তের মধ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংস্থানও রাখা হয়। সে সময়ে সংগঠন বিরোধী যে কোন কার্যকলাপের জন্য কোন শাস্তিমূলক আইন ছিল না। কারণ তখনকার সমস্ত আন্দোলনই ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত। যদিও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের তত্ত্বকে স্তালিন এই ভাবে আক্রমণ করেছেন : 'স্বতঃস্ফূর্ততার তত্ত্ব হোল সুবিধাবাদের তত্ত্ব।.. স্বতঃস্ফূর্ততা শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামী অংশের ভূমিকা নস্যাৎ করে দেয়।

'স্বতঃস্ফূর্তার পূজা করার অর্থ হোল, শ্রমিক আন্দোলনের বৈপ্লবিক চরিত্রকে অস্বীকার করা। এটা ধনতন্ত্রের বুনিয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিরোধিতা করা। স্বতঃস্ফূর্ততা হোল আদায়যোগ্য দাবি-দাওয়ার আন্দোলন। এই আন্দোলন ন্যূনতম সংঘর্ষের পথে পরিচালিত হয়।'[১] এ ব্যাখ্যা ভারতবর্ষের ধর্মঘট আন্দোলনের প্রথম যুগে আদৌ গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হতে পারে না। বরং স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ভাবধারা পাল্কি বেয়ারাদের কিছুটা সংগ্রামী চেতনার দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে। ভারতের শ্রমজীবী আন্দোলনের প্রথম যুগে, কোন নীতি, কোন তত্ত্ব বা কোন শিক্ষা ভূমিকা হিসাবে কাজ করেনি। এই সব আন্দোলনের নেতৃত্বের পিছনে ছিল অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের ন্যূনতম কৌশল; অথচ পাল্কি বেয়ারাদের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের পথকেই বেছে নিতে হয়েছে, যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে।

ভারতের প্রথম ধর্মঘট যা ধর্মঘটের ইতিহাসে পাল্কি বেয়ারাদের ধর্মঘট নামে বিখ্যাত হয়ে আছে, তাতে অংশ গ্রহণ করে পুলিশ অফিসে ধর্ণা দেওয়া, নতুন আইন বাতিল করা, বিক্ষোভ মিছিল সংগঠন করা ও উচ্চ কণ্ঠে শ্লোগান তুলে সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা সেকালের পক্ষে কম কথা নয়। পাল্কি

বেয়ারাদের এই চেতনা আগামী দিনের বৃহত্তর সংগ্রামেরই শুভ ইঙ্গিত বহন করেছে। ভারতের এই প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটের বিবরণ এ দেশের সংবাদ পত্রেও ছাপা হয়েছে। একটি পত্রিকায় পাল্কি বেয়ারাদের ধর্মঘট সম্পর্কে লেখা হয় : ·· Yesterday [21st instant] all the Theeka Bearers of Calcutta had formed themselves into a body and unanimously swore that they would not bear Palankeens until the new Regulation Promulgated for licencing them, be abolished, and that those who would disregard this agreement should be excommunicated from the community forfeiting their caste.

A litle before twelve they had gathered together and gone directly to Police Office urging against the Regulation referred to. The whole body consisting of about 1000 men being however expelled the Police office they after words resorted the meadow before the Supreme Court and raised laoud clamours.

'The further learn that they have drawn up on English Pettition which they intend forthwrith to Present to the Supreme Court'.[১০]

পাল্কি বেয়ারাদের আকস্মিক এই ধর্মঘটে ইংরেজ প্রশাসন ও ধনিক সম্প্রদায় সেদিন কেমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো তারই দৃষ্টান্ত মেলে উপরোক্ত ইংরেজী সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের মধ্যে।

৪·

ভারতের প্রথম ধর্মঘট ও সংবাদপত্র :

পাল্কি বেয়ারাদের ধর্মঘট কমপক্ষে একমাসের বেশী চলেছে। মীমাংসার কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। আলাপ-আলোচনা, মিছিল-বিক্ষোভ ও দরখাস্ত করা সত্ত্বেও কোন কাজের কাজ হয়নি। অনেক সংবাদপত্রের নৈতিক সমর্থন মিললেও, অনেক পত্রিকা পাল্কি বেয়ারাদের ধর্মঘটের নায্যতার বিষয়টি উপেক্ষা করে গেছেন। 'সমাচার দর্পণ' এমন একটি পত্রিকা যে পত্রিকায় বেয়ারাদের প্রতি সমর্থন তো দূরের কথা তাঁরা তাঁদের প্রতিবেদনে পাল্কি বেয়ারাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।

এই পত্রিকা এখনকার পাঠকদের পক্ষে দুর্লভ, তাই ঐ বিরুদ্ধ প্রতিবেদনটি প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল: 'আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতাস্থ তাবৎ-ঠিকা বেহারাদিগকে পুলিশে ডাকাইয়া মাজিস্ট্রিট সাহেব লোকেরা উত্তমরূপে এই আইনের বিশেষ বুঝাইয়াছেন এবং তাহাদের সকল ওজর শুনিয়াছেন। শুনা গিয়াছে যে চাপরাসের মূল্যের বিষয়ে তাহারদের প্রধান ওজর ছিল কিন্তু মাজিস্ট্রিট সাহেবেরা ঐ মূল্য তাহারদিগের ক্ষমা করিয়াছেন। তাহারদের প্রত্যাগমন কালে এমন বোধ হইল যে তাহারদের সকল ওজর মিটিয়া গিয়াছে এবং তাহারা সকলেই স্ব২ কর্মে নিযুক্ত থাকিবেন। কিন্তু এখন কলিকাতায় এক বেহারারও মুখ দেখা যায় না। ইহাতে অনুমান হয় যে ইহার মধ্যে কিছু দুষ্টতা থাকিবেক। এই নতুন ব্যবস্থা বিষয়ে কেহ২ এই এক ওজর করে যে কেবল সময়ানুসারে হার না করিয়া যদি দূরাদূর বুঝিয়া করা যাইত তবে ভালো হইত। যেহেতুক কলিকাতা হইতে কালীঘাটে কোন বাবুকে লইয়া যাইতে হইলে মারপিটে এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায় এবং সে এক ঘণ্টার মজুরি তাহারা প্রত্যেকে কেবল এক২ আনা করিয়া পাইবেন। কিন্তু সেই এক ঘণ্টায় তাহারদের যাবৎ দিবসের বলা যাইবে।

'আরো কলিকাতার এক ইংরেজী সমাচার পত্রে বেহারাদের পক্ষপাতী হইয়া কেহ লিখিয়াছেন যে সময়ানুসারে বেতন নিরূপণের নতুন আইন হওয়াতে বেহারাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইয়াছে। যেহেতুক বেহারাদের ঘড়ী নাই আরোহকেরদের আছে এবং ইতর লোক অপেক্ষা মান্য লোকের কথা প্রায় সর্বত্রই অধিক মান্য। এমন অনেক মান্যলোক আছেন যে

তাঁহারা দেড় ঘণ্টা কিম্বা ততোধিক কাল পর্যটন করাইয়া ঘড়ী দেখাইয়া এক ঘণ্টাব বেতন দান করিবেন। বেহারা বেচারা তাহাতে বাক্য কহিতে পারিবে না, কহিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক সুতরাং মাদারির মৃত্যু। অতএব ঐ লেখক কহিয়াছেন যে সরকারী ব্যয়ে প্রত্যেক বেহারাকে একটা ঘড়ী দেওয়া যায় তাহা হইলে বেহারারা যখন পাল্কি ঘাড়ে করিবে তখন টেক হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিবেক তাহাতে আরোহকের ঘড়ীর সঙ্গে যদি ঠিক মিলে তবে কিছু অন্যায় হইতে পারিবেক না কিন্তু যদি না মিলে তবে উভযে কলিকাতার বড় গির্জায় গিয়া আপনারদের ঘড়ী ঠিক করিবে। কিন্তু সেখানে যাইবার মজুরি বেহারাদের নিজ খরচ।

'সে যে হউক বেহাবারা চলিয়া গিয়াছে। হইতে পারে যে তাহারা শ্রীক্ষেত্র দর্শনে গিয়াছে। সংপ্রতি রথযাত্রা উপস্থিত ভরসা হয় যে একবার রথ টানিয়া কলিকাতায় আসিয়া পুনর্বার পাল্কি বহিবেক। ইতোমধ্যে কলিকাতা নগরে ঘোড়া সকল পাল্কি বেহারা হইয়াছে এবং বোধ হয় যে দুই তিন হপ্তার মধ্যে ঘোড়াদের সভা হইয়া এক দরখাস্ত উপস্থিত হইবেক। ইহাও অসম্ভব নয়, যেহেতুক হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে ষাঁড় শৃগালাদি কথা কহিয়াছে।"[১]

সংবাদপত্রের এ ধরণের উক্তিই প্রমাণ করে যে সংবাদপত্র রাষ্ট্র শক্তিরই পৃষ্টপোষকতা করেছে মাত্র। সোদিনের সংবাদপত্রের সামাজিক দায়িত্বহীনতা চোখে পড়ার মতোই। জনগণকে এবং জনগণের আন্দোলন বিক্ষোভগুলিকে বানচাল বা বিভ্রান্ত করার ক্ষেত্রে তদানীন্তন সংবাদপত্রগুলি সরকারী নীতির প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে। বিশেষ করে বিদেশীদের দ্বারা সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্রিকাগুলির ভূমিকাই ছিল দেশীয় জনগণের যে কোন রকম কাজের বিরোধিতা করা। অপরপক্ষে বাঙলা সংবাদপত্রগুলি ভারতের ধর্মঘটের প্রথম যুগের আন্দোলন সমূহের প্রতি তেমন জোরাল সমর্থন জানায় নি। জানাবেই বা কি করে? গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়ায়েই কাল কাটাতে হয়েছে তাদের। বিদেশী শাসককর্তৃক তাদের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তাতেই অনেক কাল কেটে যায়। সে পৃথক এক লড়াইয়ের ইতিহাস।

রাষ্ট্র ক্ষমতাকে দখল করে রাখার জন্যে ইংরেজশাসক কত অপচেষ্টাই না করেছে। ইংরেজের নানা ধরণের কূট-কৌশলের উপযুক্ত জবাব দিতে তখন পর্যন্ত কোন শক্তিশালী গণসংগঠনের জন্ম হয়নি। এক মাত্র সংবাদপত্রই

যে কোন অন্যায় ও জোর জুলুমের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সাধ্য মতো চেষ্টা করেছে। সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বা যে কোন রকম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে আলোচনা অথবা সামাজিক সমালোচনা সংবাদপত্র প্রথম থেকেই করে এসেছে। সংবাদ পত্রের এইসব বলিষ্ঠ প্রতিবাদ বৃটিশ আমলাতন্ত্রকে ভাবিয়ে তুলেছিল।[২]

ভারতেব পাল্কি বেয়ারাদের ধর্মঘটের পক্ষে ১৮২৭ সালের সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল বিরোধিতার। বিশেষ করে 'সমাচার দর্পণ' এই বিষয়ে তার যুক্তি নির্ভর উন্নত মানের সাংবাদিকতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য তাঁরা অহেতুক সরকারের বিরুদ্ধে লেখা-লেখি করে নিজেদের বিপদ নিজেরা ডেকে আনতে চায়নি। কিন্তু এদেশে ১৮২৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল থেকে 'অ্যাডাম রেগুলেশনস্' চালু হলে সংবাদপত্রগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। সংবাদপত্রগুলিই ক্রমাগত সরকার বিরোধী প্রস্তাবের দ্বারা গণসংগঠন গড়াব কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছে। লেনিন সংবাদপত্রের দায়িত্ব প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে 'সংবাদ-পত্রেব সাহায্য ছাড়া বিভিন্ন শক্তিশালী রাজনীতিক সংগঠনকে তালিম দেবার অন্য কোন উপায় নেই'।[৩] ভারতীয় সংবাদ-পত্রগুলির স্বাধিকার অর্জনের পথে প্রথম থেকেই বহু বাধা বিঘ্ন থাকায় তেমন কোন রাজনৈতিক সংগঠন গড়াব কাজে তারা মদত দিতে পারেনি। অন্যদিকে দেশে সরকারী দমন নীতির বিরুদ্ধে তেমন কোন রাজনৈতিক সংগঠনের প্রচেষ্টাও দেখা যায়নি। এলাকায় এলাকায় মজুবত গণসংগঠন গডে তোলার কাজে সংবাদপত্রের ভূমিকাকেই বেশী গুরুত্ব দান করে ছিলেন স্বয়ং লেনিন।[৪] কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে, তার আন্দোলনগুলির প্রথম যুগে তেমন কিছু করে ওঠা সম্ভব হয়নি। তাই ধর্মঘটের প্রথম যুগে সংবাদপত্রগুলির নৈতিক সমর্থন যেমন মৃদু ও দুর্বল, তেমনি সংবাদ পরিবেষণের ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটাতে পারেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা উল্লেখ করেছি যে পাল্কি বেয়ারাদের ধর্মঘটের প্রতি সহানুভূতি অপেক্ষা পাল্কি বেয়ারাদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য প্রকাশের দ্বারা ধর্মঘট ভাঙায় সাহায্য করে এক ন্যাক্কারজনক উদাহরণ তৈরি করেছেন, তাঁরা। তাঁরা বেয়ারাদের পরিবর্তে ঘোড়া দিয়ে পাল্কি চলানোর পরামর্শ কর্তৃপক্ষকে দিয়েছেন। এই ভাবে ভারতীয় গণআন্দোলন বা ধর্মঘটের প্রাথমিক ইতিহাসের পাতায় এদেশীয় সংবাদপত্র কোন অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি। বিষয়টি

দুঃখের হলেও ঐতিহাসিক সত্য।

ভারতের প্রথম ধর্মঘট নানা চক্রান্তে ও ষড়যন্ত্রে অসফল হলেও, এ ধর্মঘটের কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য না থাকলেও, শ্রমজীবী শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে এ এক নতুন শিক্ষা দান করেছে। এই শিক্ষা পরবর্তী কালের দেশীয় শ্রমজীবী শ্রেণীর পক্ষে কঠিনতর সংগ্রামের প্রেরণাস্থল হয়েছে। অধিকন্তু এই ধর্মঘট ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীকে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের উপযোগী করে গড়ে তোলার কাজে কঠিন, অসামান্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৫.

অপরাপর ধর্মঘট

ক। গাড়োয়ান ধর্মঘট

১৮২৭ সালের পাল্কি বেয়ারাদের 'ধর্মঘট' অসফল হলেও এই আন্দোলন ধর্মঘটের 'ইতিহাসে এক স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেল। অ-সংগঠিত শ্রমজীবী শ্রেণী যে-ভাবে এ আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন, ইতিহাসে তা ছিল এক নতুন শিক্ষা। আগামী দিনের জন্য তাঁরা এ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন প্রেরণা এবং শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নীতি ও কৌশল'।[১] পাল্কি বেয়রাদের ধর্মঘটের প্রকৃত শিক্ষা নিয়েই পরবর্তী কালের অপরাপর শ্রমজীবী মানুষ ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে নিজেদের মুক্তির প্রেরণা অনুসন্ধান করেছিলেন। তাই পাল্কি ধর্মঘটের পরেই গাড়োয়ানদের ধর্মঘট আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতার গাড়োয়ানদের স্বাধীন জীবিকার প্রশ্নেও উনবিংশ শতাব্দীর আকাশে কালো মেঘ জমে ওঠে। ১৮৫১ সালে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরাই ধর্মঘটের ভিতর দিয়ে সরকারী বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিতে এবং অধিকাব আদায় করতে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে।

পরিবহন হিসেবে গরুর গাড়ীর কদর সেযুগে কম ছিল না। তখনকার দিনে কম পয়সায় এত সুন্দর যানবাহন ছিল না বললেই চলে। আধুনিক যন্ত্রযানের যুগেও গ্রাম জীবনে গ· গাড়ীর ব্যবহার ফুরিয়ে যায়নি। দ্রুত গতি যানের শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলেও, গরুর গাড়ীর যুগ এখনও শেষ হয়নি। এই বিষয়ে আমরা আজ বুঝতে পারি যে, সে যুগের পক্ষে সেদিন গরুর গাড়ীর অপরিহার্যতা কতখানি ছিল। যোগাযোগকারী যান হিসেবে গরুর গাড়ীর ব্যবহার পারিবারিক জীবন থেকে যুদ্ধ ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় যুদ্ধ ক্ষেত্রে বারুদ-বন্দুক, গুলি-গোলা প্রভৃতি বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে গরুর গাড়ীকে কাজ লাগানো হয়েছিল। বারুদ, বন্দুক গোলাগুলি সহ প্রত্যহ ২০০ সৈন্য সমর প্রাঙ্গণে গরুর গাড়ী করেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।[২] বাণিজ্যিক শোষণের কেন্দ্রভূমি কলকাতার মানচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর গরুর গাড়ীর উপযোগিতা তাই কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। ১৮৩৩ সালে উইলিয়ম উড অঙ্কিত চিত্রে গরুর গাড়ীতে

একালের বাসের মতো যাত্রী সাধারণকে বাদুড় ঝোলা হয়েও যেতে দেখা যায়। সাম্রাজ্যবাদী শাসক, নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির কারণে, গরুর গাড়ীর মতো একটি অপরিহার্য যানবাহনের ক্ষেত্রে, অনাবশ্যক ভাবে করের বোঝা চাপাতে দ্বিধা করেনি। কেবল গরুর গাড়ীর ক্ষেত্রে নয়, করের বোঝা বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি অপরাপর যানের ক্ষেত্রেও প্রচার করা হয়েছিল। কুলিমজুর কিংবা মুটেদের ক্ষেত্রেও একইভাবে করবৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছিল। বিভিন্ন যানবাহন ও কুলি, মজুর ও মুটেদের আয়ের উপর যে কর নির্ধারণ করা হয়েছিল তার একটি সামগ্রিক তালিকা প্রকাশ করে তৎকালীন জনপ্রিয় বাঙলা সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর'। তালিকাটি বিশেষভাবে অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, সরকারী করেব মাত্রা কি হারে বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এই কর ধার্য করা হয় কলকাতা করপোরেশনের মাধ্যমে :

স্প্রিংওয়ালা ৪ চাকার যাবতীয় প্রকার গাড়ী	২ টাকা
„ ২ „ „ „ „	১ „
„ এতদ্দেশীয় নানা প্রকার শকট	দুই-আনা
স্প্রিং শূন্য নানা প্রকার চারি চাকার গাড়ী	ছয় „
ঐ দুই চাকাওয়ালা	চার „
ঐ দুই ৩ ফিট ও ৬ ইঞ্চি বেড় ও ৩ ইঞ্চি পরিমিত লৌহ পত্র যুক্ত-নানা প্রকার শকট	।।০ „
ঐ প্রকার কিন্তু যদ্যপি চাকার ও লৌহ পত্রে বেষ্টিত ও পরিসর ৩ ফিট ৬ ইঞ্চি ও ৩ ইঞ্চি হইতে কম হয়	দুই „
ফি মহিষ অথবা গরু	দু-পয়সা
„ হস্তি	১ টাকা
„ উষ্ট্র	।০ আনা
„ ঘোটক	/০ „
ফি কুড়ি মেষ অথবা ছাগ	৵০ „
„ শত শূকব	।০ „
ফি খচ্চর	এক-পয়সা
„ গর্দভ	দু „
„ বেহারাওয়ালা পাল্কী ৩ জন	১ টাকা
„ পালনা নামক এতদ্দেশীয় ক্ষুদ্র পাল্কী	।০ আঁনা
„ বেহারাওয়ালা ডুলি	দুই „
কোন ব্যক্তি যদ্যপি ভাড়া লইয়া মোট বহে	দু-পয়সা'

অপিচ যদ্যপি অন্য কোন প্রকার পশু দ্বারা যান বাহিত হয় তবে তৎপ্রতি ও উপরিউক্ত হারানুসারে কর বসিবেক'।[৩]

১৮৫১ সালের গরুর গাড়ীর কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে গাড়োয়ানরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সরকারী কর নীতির বিরুদ্ধে 'ধর্মঘট' পালন করতে তাঁরা বাধ্য হন। গাড়োয়ানরা 'ধর্মঘট' করে সেকালের সচল কলকাতাকে প্রায় অচল করে দিয়েছিলেন। দু-পয়সা কর ধার্য করা হলে, গাড়োয়ানরা এই করনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানিয়ে পারেননি। গাড়োয়ানদের ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়া বণিক সমাজের উপর গিয়েও পড়ে। এই ধর্মঘটের ফলে বণিকদের বেশ ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। কলকাতার শিল্প বাণিজ্যেও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

সরকার এই গাড়োয়ান ধর্মঘটের বিরুদ্ধে তেমন কিছু প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। ফলে গাড়োয়ানদের দাবি মেনে নিয়ে বর্ধিত দু-পয়সা করের বোঝা কমিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। বোধ করি ধর্মঘটের প্রথম যুগে ধর্মঘটীদের জয় এই প্রথম। ইংরেজ সরকার তাঁর কঠোর মনোভাব কিছুটা শিথিল করে দু-পয়সা কর প্রত্যাহার করে নিয়ে নগরবাসী ও বণিকগণের স্বার্থরক্ষা করেন। কিন্তু একদিকে গাড়োয়ান-সমাজ সরকারী আদেশকে ভয় না করে আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করে নেন; অপরদিকে অপরাপর শ্রমজীবী মানুষেরা সরকারের করনীতি মেনে নিয়ে সরকারী শোষণের শিকার হয়েছেন। সেদিন যদি যথার্থ রাজনৈতিক শিক্ষা ও সংঘবদ্ধ সংগ্রামী চেতনা সকলের থাকতো তাহলে একই সময়ে এক শ্রেণীর জয় এবং আর এক শ্রেণীর শোষিত হওয়ার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হোত না। সংঘবদ্ধ আন্দোলনই যে আরো ব্যাপক সফলতা অর্জন করতো পারতো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেকালের পক্ষে তা সহজ হয়ে উঠেনি। মূল সমস্যা একটা ছিলই।

তৎকালীন ধর্মঘট বা অন্যান্য আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে যথার্থ নেতৃত্বের অভাব বড় বেশী চোখে পড়ে। রাজনৈতিক চেতনায় শ্রমজীবী শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করা সহজ কাজ ছিল না। এই চেতনা আপনা আপনি কখনই আসে না। এ চেতনা জাগ্রত করার জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত নেতৃত্বের। ভারতের শ্রমজীবী শ্রেণীর কাছে যথার্থ সংগ্রামের দিকটি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। গাড়োয়ানেরা যেখানে সংঘবদ্ধ ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ের কৌশলটি অবলম্বন করেন, ঠিক সেভাবে অন্যান্যেরা কর বৃদ্ধির

প্রতিবাদে সংগঠিত হতে পারলেন না।

এ প্রসঙ্গে 'সংবাদ ভাস্কর' সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ চেতনার অভাববোধ লক্ষ্য করে লেখেন: 'মুটেরাও গাড়োয়ানদিগের সহিত যোগ দিয়াছে, গাড়োয়ান ও মুটে পাঁচ ছয় সহস্র লোক একত্রে হইয়া ডেপুটি গবর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে তাহারদিগের প্রতি এই ট্যাক্স ক্ষমা হয় কিন্তু উক্ত মহাশয় সাহেব তাহারদিগের উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, উড়ে বেহারা, রোমানি বেহারা, গরু-গাড়োয়ান ইত্যাদি নীচ লোকেরা ঐক্য বাক্য আছে কিন্তু আশ্চর্য এই যে ইহা দেখিয়াও এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা লজ্জা জ্ঞান করেন না, আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া কি গাড়ী ঘোড়া পরিত্যাগ করিতে পারি না, এ দেশে যখন গাড়ি ঘোড়া ছিল না তখন কি যানবাহন দ্বারা মান্য লোকদিগের কর্ম চলে নাই, সম্ভ্রান্ত লোকেরা গাড়ী ঘোড়ার কর নিবারণ করিতে পারিলেন না এই ক্ষণে গাড়োয়ানদিগকে আশীর্বাদ করুন।'[৪]

'সংবাদ ভাস্করে'র এই প্রতিবেদন সেকালের পক্ষে যথার্থ হলেও এজন্যে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। উপার্জক শ্রেণীর 'অপরিণত' সংগ্রামী চেতনার দিকটি তদানীন্তন যুগের সমাজের অপরিণত অবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল। এদের যথার্থ চেতনা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার পক্ষে সমাজে বিশেষ কোন শ্রেণী-শক্তির আবির্ভাব ঘটেনি। যার দ্বারা নীচুতলা থেকে সংগ্রামী মানুষের আত্ম প্রত্যয়ের দিকটি সামগ্রিক এক ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৬২ সালের আর একটি ঘটনা থেকে গাড়োয়ান ধর্মঘটের বৃত্তান্ত জানা যায়। এই ধর্মঘটের সঙ্গে অর্থনৈতিক কোন সমস্যা বা সংকট জড়িত ছিল না। ধর্মের নামে একটা চক্রান্তের জাল বিস্তার করাই ছিল গাড়োয়ানদের জীবিকার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অন্যতম কৌশল ও প্রেরণা।

ধর্মে মানুষের অগাধ বিশ্বাস থাকায় এবং ধর্মে অচলা ভক্তি থাকায়, জীব সেবার সঙ্গে শিব সেবার আড়ালে গাড়োয়ানদের জব্দ করার জন্যে কলকাতায় হঠাৎ-ই গজিয়ে ওঠে একটি প্রতিষ্ঠান। যার নাম দেওয়া হয় 'পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণী সভা।' এই সভার মধ্যে দিয়েই পশুর প্রতি মমত্ব-বোধের প্রেরণা নিয়ে, শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণের একটা কৌশল সুন্দরভাবে উপস্থিত করা হয়। 'অত্যাচার নিবারণী সভাকে' পুঁজিপতি সাহায্যের মধ্যে দিয়ে আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী শোষকের কৌশল কোন পথে পরি-

চালিত হয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই জানি জীব হিসেবে যে কোন পশুর প্রতি নির্মম অত্যাচার, মানবতা বিরোধী। কিন্তু আইন করে কিংবা জোর জবরদস্তি করে কোন দিন সেই অত্যাচার বন্ধ করা যায় না। পুলিশের সাহায্য নিয়ে জেল জরিমানার মধ্যে দিয়েও কোন কোন সমস্যার সমাধান হয়, তবুও পশুক্লেশ নিবারণী সভা কেন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গাড়োয়ানদের প্রতি জরিমানা-সহ দুর্ব্যবহার করতে চেয়েছে? এর সঙ্গে কোন নীতিবোধ বা আদর্শবাদ জড়িয়ে ছিল না। সাদা চোখে দেখলে সহজেই বলতে পারা যায় যে জরিমানা আদায়ের মারফৎ আয়ের উৎস খুঁজতে এবং গাড়োয়ান-দের মধ্যকার ঐক্যবদ্ধ চেতনায় ফাটল ধরাতে এ এক অপচেষ্টার নজির সৃষ্টি করেছে মাত্র। পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশের বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ গ্রহণ করা যেতে পারতো। কিন্তু তা করা হয়নি। 'শ্রেণী সংগ্রামের অবসান হলে মানুষ ধর্মের প্রয়োজন কাটিয়ে উঠবে' এ শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি অবলম্বন না করে, সরকার পুলিশ দিয়ে জরিমানা আদায়ের চেষ্টা করেছে। এর প্রতিবাদে সেকালের শ্রমজীবী শ্রেণীর সবচেয়ে সচেতন অংশ ধর্মঘটকেই সামাজিক ন্যায়াধিকার প্রতিষ্ঠার এক মাত্র অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। গাড়োয়ানদের এই ধর্মঘটও কলকাতার জনজীবনকে সেদিন স্তব্ধ করে দিয়েছিলো। কলকাতা নগরের সমস্ত গরুর গাড়ী চারদিন পর্যন্ত ধর্মঘট পালন করে।

৩ রা সেপ্টেম্বর থেকে গাড়োয়ানদের এই ধর্মঘট শুরু হয়। কিন্তু এবারের ধর্মঘট স্থায়ী কিছু প্রতিকার আদায়ে ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ব্যর্থতা সংগ্রামী গাড়োয়ান সমাজের জন্যে নয়। সরকারই এই ধর্মঘটকে সম্পূর্ণ বেআইনী ঘোষণা করলেন। গাড়োয়ানদের এই ধর্মঘট স্থায়ী কিছু আদায় করতে না পেরে মাঝ পথেই কেমন যেন খাপছাড়া পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হয়ে যায়। ধর্মঘট ভাঙার জন্যে সরকার নানারকম কূট-কৌশল ও চক্রান্ত করলেও, গাড়ো-য়ানদের চেতনাকে সহজে নিষ্প্রভ করতে পারেনি। মূলতঃ এ ধর্মঘট ব্যর্থ হলেও গাড়োয়ানদের প্রতিবাদের ভাষা ছিল উচ্চগ্রামে বাঁধা। বহুদিনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনার ধূমায়িত রোষানল ফুলে ফেঁপেই উঠেছে।

প্রজাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টায় শোষকের এ এক অভিনব প্রচেষ্টা। কালে কালে দেশে দেশে শোষকের ভূমিকা একই। শুধু অবস্থা ভেদে ও প্রয়োজনানুযায়ী তাদের মুখোশটারই বদল ঘটে থাকে? শাসন ও শোষণ কায়েম রাখতে জন-জীবনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে না পারলে যে কোন

সময় প্রজা বিদ্রোহের আশংকা নিশ্চিত জেনেই, বৃটিশ শাসক নানারকম কূট-কৌশলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে ?

সবচেয়ে নীচুতলার মানুষ হিসেবে গাড়োয়ানদের ওপর বিভিন্ন সময়ে; বিভিন্নভাবে শোষণের চেষ্টা চলছে গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরেই। বেশ কয়েকটি নির্দেশাত্মক নীতির ভিতরেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের আসল স্বরূপ। গরুর গাড়ী দ্রুতগতিতে চালানোর ক্ষেত্রেও বিধি-নিষেধ জারি করা হয়েছে। নতুন নিষেধাজ্ঞায় জেল ও জরিমানা—দণ্ড হিসবে দুয়েরই ব্যবস্থা ছিলো। এই নতুন নিয়ম বলবৎ হবার কিছুদিন বাদেই কয়েকজন গাড়েয়ানের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে জেল হয়ে যাওয়ায়, গাড়োয়ানদের মধ্যে আবার দেখা দেয় চাপা উত্তেজনা। সেই উত্তেজনা ক্রমশ বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ ও আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। শুধুমাত্র জেল ও জরিমানাই নয়, জেলের মধ্যে নির্যাতনের অঙ্গ হিসেবে গাড়োয়ানদের দাড়ি গোঁফ ছেঁটে দেওয়ার ঘটনা সমস্ত গাড়োয়ানদের আরও বিক্ষুব্ধ কবে তোলে। এইসব ঘটনার প্রতিবাদে দক্ষিণের রাজপুর গ্রাম, উত্তরের দমদম থেকে পশ্চিমের খিদিরপুব অঞ্চলের গাড়োয়ানরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কোলকাতা ও শহরতলীর সমস্ত গরুর গাড়ীর চালকেরা গড়ের মাঠে সমবেত হয়ে ধর্মঘট পালনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ কবে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে গাড়ী চালানো সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। তাঁদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করায়, কোন গাড়োয়ান আর গাড়ী চালাতেই রাজী হলেন না। কোলকাতার পুরসভা-এলাকার সংবাদ পরিবেষণ করতে গিয়ে তৎকালীন একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'মধ্যস্থ' লেখেন : 'এ ব্যাপার ৩।৪দিন থাকে। এই কয়দিন কলকাতার একখানিও ঠিকা গাড়ী দেখা যায় নাই। শনিবার রাত্রে লাইসেন্স প্রাপ্ত যে কোনো গাড়োয়ান পরদিন গাড়ি বাহির না করিবে তাহার ৫ টাকা জরিমানা হইবে এইরূপ পুলিশের আজ্ঞা প্রচার হওয়াতে পুনরায় সকলে গাড়ী বাহির করিয়াছে। এক্ষণে এই গাড়ী বন্ধ ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া গিয়াছে। কিন্তু গাড়োয়ানরা ক্ষান্ত হয় নাই।'[৫]

না হবারই কথা। গাড়োয়ানদের বিরুদ্ধে যখন তখন নির্যাতন ও অত্যাচার কখনো পরোক্ষ, কখনো প্রত্যক্ষ ভাবে চলেছে। গাড়োয়ানদের দাড়ি কামানো ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ জেনেও দাড়ি কামিয়ে দিয়ে একটি ধর্ম বিরোধী

কাজ তো সরকার করেইছে, আবার সেই সঙ্গে জরিমানা করার মধ্যে তৎকালীন শাসক সম্প্রদায়ের আচরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেন-তেন প্রকারে গরুর গাড়ীর চালকদের জীবনে অর্থনৈতিক সংকটকে ঘনীভূত করে তোলা,—উদ্দেশ্য যাতে এই দুর্বল সমাজ কোন ভাবেই মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এ ক্ষেত্রে ইংরেজ তাঁর কূটবুদ্ধি নিয়ে কোথাও বা ধর্মের পক্ষে, কোথাও বা ধর্মের বিরুদ্ধে এমন সব পরিস্থিতি তৈরি করেছে, যাতে জনগণ সংগ্রামী আন্দোলনের পথ থেকে বিচ্যুত হয়। দুর্বল মানসিকতাকে আরোও দুর্বল ও কোমল করার যুক্তি নির্মাণে নানা রকম প্ররোচনা সহ বিধি নিষেধ জারি করে তদানীন্তন প্রশাসন শোষণের কৌশলটিকে সক্রিয় রাখতে চেয়েছে। অপর দিকে শ্রমজীবী শ্রেণী হিসেবে গাড়োয়ানদের ঐক্যবদ্ধ ও একত্রিত হওয়ার ভিতরেও একটি মৌলিক সমস্যা থেকে যায়। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্যে যে মানসিকতা, যে শিক্ষা ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে, তা উপলব্ধি করার মতো সূক্ষ্মবুদ্ধি বা যথার্থ শিক্ষা গাড়োয়ানদের মধ্যে সেদিন ছিল না। থাকবেই বা কি করে? তাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সরকার বাহাদুর যা ইচ্ছে তাই করতে চেয়েছেন এবং করেছেনও। সরকারী আদেশ বা অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো সংগ্রামী চেতনা সেদিনের গরুরগাড়ীর চালকদের ছিল না। কয়েক দিনের ধর্মঘট জনজীবনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও, সরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রে তেমন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং শাসনের শক্ত ফাঁস ও ফন্দী ধর্মঘট ভাঙায় সফল ভাবে চেষ্টা করে গেছে। তবে এ কথা স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠা নেই যে ভারতের ধর্মঘটের প্রথম যুগে গাড়োয়ানদের বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত 'ধর্মঘট'-আন্দোলনগুলি পরবর্তী কালের শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে একটা বৃহত্তর সংগ্রামের ভিতরে টেনে আনে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ও প্রদেশে শ্রমজীবী শ্রেণী সমূহের উপর একের পর এক যে সব আঘাত আসে তা মূলতঃ অর্থনৈতিক ততটা নয়, যতটা ছিল রাজনৈতিক সচেতনতা-প্রসূত।

খ ॥ রজক ধর্মঘট

পলাশী যুদ্ধের ঠিক আগের বছরে অর্থাৎ ১৮৫৬ সালে কলকাতায় 'রজক ধর্মঘট' স্বাভাবিক ভাবে অর্থনৈতিক কারণেই ঘটে। রজক 'ধর্মঘট'

সেকালের কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে চিন্তিত করে তোলে। কোন প্রতিবাদ নয়, কোন প্রতিরোধ নয়, বিশেষ কোন ঘটনাতেও নয়, রজকদেব বিক্ষোভ ছিল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে নিজেদের পারিশ্রমিকের বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠার কারণেই। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে, স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত শ্রেণীরও উপার্জন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও, কলকাতার রজকদের জামা-কাপড কাচার কোন মূল্যবৃদ্ধি হয়নি। একই মূল্যে কাপড কেচে জীবন যাপন করা তাঁদের পক্ষে বেশ কষ্ট-সাধ্য হয়ে পড়ে। এর প্রতিকারকল্পে রজকদেবও শ্রেণীচেতনা ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে। অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণী সেখানে দাবি আদায়ের পথ হিসেবে ধর্মঘট পালনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের বাঁচার অধিকার অর্জনের চেষ্টায় উদ্যোগী, তখন কলকাতার রজকরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন?

কলকাতার কৃষ্ণবাগানের রজকেরা এগিয়ে এলেন কাপড কাচার মূল্যবৃদ্ধির দাবিতে। তাঁরা এক সভায় মিলিত হয়ে ধর্মঘট করার প্রস্তাব করেন। এবং সেই প্রস্তাব সমবেত রজকরা মেনে নেন। তাঁরা সভায় মিলিত হয়ে স্থির করলেন যে এক পয়সার কাপড দু-পয়সা না পেলে আর কাচবেন না। এবং তাঁদের দাবী না মানা হলে কাপড় কাচা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ থাকবে। তাঁরা কাপড কাচা বন্ধ রেখে কেবল ধর্মঘট পালন করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলেন না, তাঁরা শহরের স্ব সম্প্রদায়ের সকলকে সংগঠিত এবং সংঘবদ্ধ হওয়াব জন্যেও আহ্বান জানালেন। তাঁরা তাঁদের ন্যায্য দাবির সমর্থনে বক্তব্য রেখে বলেছিলেন: 'এক টাকায় চাউল দুই টাকা হইয়াছে, এক পয়সার মাছ দুই পয়সায় বিক্রি হইতেছে, মুটেরা মোট লইয়া যে স্থানে এক পয়সায় যাইত দুই পয়সা না পাইলে সে স্থানে যায় না, আমরা এক পয়সার হাঁড়ী দুই পয়সায় না দিলে পাই না পূর্বে টাকায় ছয় মণ কাঠ বিক্রয় হইত এখন তিন মণের অধিক দেয় না। এইরূপ সকল বিষয়ে দ্বিগুণ লাভ হইতেছে তবে আমরাই বা কি কারণ চিরকাল এক মূল্যে থাকিব। অতএব সকলে প্রতিজ্ঞা কর এক পয়সায় যে কাপড় কাচিয়া থাকি দুই পয়সা না পাইলে তাহা কাচিতে পারিব না'।[৩]

সভার প্রস্তাবিত ধর্মঘটে রজকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দিনের পর দিন চলতে থাকায় ভদ্র কি দরিদ্র সব পরিবারেই দারুণ সমস্যা দেখা দেয়। যাঁরা নগদ পয়সায় কাপড় ধোলাই করতেন তাঁরাও বেশ বিপদে পড়েন। রজকগণ

কারও কাপড় নিতে চান না। কেউ কেউ দু-চার খানি কাপড়-কাচার জন্যে রজকের কাছে অনুরোধ করে। রজকরা তাঁদেরকে সোজা সুজি সাফ কথা বলে দেয় যে একটা কাপড়ে দু-পয়সা অগ্রিম দিলে তবে কাপড় কেচে দেবো নতুবা পারবো না। কোন কোন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রজক কাপড়-কাচা ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ারও ভয় দেখাতে চেষ্টা করেন এবং আরও বলেন যে তাঁরা আর জাত ব্যবসা করবেন না, ছেলে মেয়েদের পাঠশালায় পড়তে দিয়েছেন, এবার থেকে কাপড়ের মোট বওয়া ত্যাগ করবেন।'[৭]

গ॥ ক্ষৌরকার ধর্মঘট

গুণ ও কর্মের ভিত্তিতেই ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার বিন্যাস। কিন্তু নানা কারণেই কর্মেব সঙ্গে বর্ণ তথা বৃত্তির সঙ্গে বর্ণের একটা যোগসূত্র বহুকালধরে আমাদের সমাজে চলে আসছে। পেশাভিত্তিক বর্ণ-বিভাগ হওয়ায়, এক বর্ণের বৃত্তি আর এক বর্ণ গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে, বহুকাল ধরে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত নানা বর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষদের বৃত্তির কোন রদবদল ঘটেনি। স্ব-বর্ণগত চেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকার ফলে নিজেদের বৃত্তি ত্যাগ করে, অন্য বৃত্তি গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। বৃত্তির বাইরে কোন কিছু করা সহজ ব্যাপার ছিল না। বর্ণ বিশুদ্ধি রক্ষার জন্যে বর্ণগত বা জাতিগত পেশাকেই মেনে নিতে হয়েছে। এককথায় বংশানুক্রমিক শ্রম ও কর্মের সঙ্গে জাতিগত মর্যাদা জড়িত থাকায়, বংশ পরম্পরায় সকলেই একই কাজ করে এসেছেন।

আমরা জানি যে, হিন্দু সমাজের বর্ণবিভাগ পেশাগত ভিত্তির উপরেই রচিত এবং তা সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী উপ-পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। আবার বর্ণ ও বৃত্তির সঙ্গে ধর্মের সংস্কার এমন ভাবে যুক্ত হয়ে আছে যে, যাকে উপেক্ষা করে একটা স্বাধীন চিন্তার অবকাশ সৃষ্টি করতে সমাজ কোন দিনই পারে নি। ধর্মের সঙ্গে সংস্কার এমনই ভাবে যুক্ত হয়েছিল যে, ব্যক্তি মানুষ ও তার স্বাভাবিক চিন্তা ভাবনাকে খুব বেশী এগিয়ে নেওয়ার প্রেরণা খুঁজে পায়নি। সবচেয়ে বড় কথা ঈশ্বর বিশ্বাস এবং পরলোক বিশ্বাস উদার বা সরল চিন্তার পক্ষে বড়ো বেশী অন্তরায় ছিল। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মভাবনায় প্রকট পরলোক-ভীতির কারণে কেউই জাতিগত বা বর্ণগত পেশা ত্যাগ করতে চায়নি। 'জাতি ধর্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।'

পরনে তাকে কেমতে বল পাইবে নিস্তার'।[৯]

এমন অবস্থায় কেইবা সহজে ধর্মচ্যুত তথা জাতি চ্যুত হতে চায়? বর্ণের সঙ্গে কর্মকে মিলিয়েই আমাদের ভারতীয় সমাজ গড়ে উঠেছে। বলাই বাহুল্য সেই আদিকাল থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক ভারতবাসীই তথাকথিত professional caste হিসেবে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য ও অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে নিজ নিজ পেশার মধ্যেই নিযুক্ত থেকেছেন। কিন্তু এই জাতিগত পেশায় নিযুক্ত মানুষেরা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই 'ব্রিটিশ সরকারের পদতলে ভারতবর্ষের মনুষ্যত্ব-নির্ভর ধর্মের পবিত্র ঐতিহ্যের ধারা হাবিয়ে ফেলতে বসল তার ভারসাম্য, তার চিন্তাধারা।'[১০]

স্বাধীন জাতিগত পেশার ক্ষেত্রে উনিশ শতকের সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যেও বৃটিশ সরকার তার আয়ের উৎস খুঁজতে বৃত্তিকর অথবা লাইসেন্স ব্যবস্থাকে জোরদার করাব চেষ্টা করেছে। সেকালের জাতিগত পেশায় নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অর্থাৎ নাপিত, ধোপা, কসাই মেথর প্রমুখের বৃত্তিকর ধার্য করে ইংরেজ সরকার তার সুখ-সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করেছে। সেই সঙ্গে নিজেদের প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্যেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন করের বোঝা এদেশের প্রজা সাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

১৮৫৬ সালের পৌরকর বাবদ আদায় হয়েছিল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত সম্প্রদায় এবং সকল শ্রেণীর যানের উপরও বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বসিয়ে রাজস্বের পরিমাণ দিনের পর দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতায় বসবাসকারী জাতি ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে কর আদায় করে রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছিল তার একটি সরল হিসাব থেকে উপলব্ধি করা যাবে বৃটিশ সরকার ভারতে আয়ের পথ খুঁজতে কিভাবে রাজস্ব দিন দিন বৃদ্ধি করেছিল। কলকাতায় রাজস্বের পরিমাণ অতি দ্রুত বৃদ্ধির তালিকা থেকে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন যে, বিদেশী শোষণ ধীরে ধীরে এদেশকে শুষে নিতে অগ্রসর হয়েছে। এখানে ভূমি-রাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য করের হিসেব দেওয়া হলো:[১]

বৎসর	রেটস্ ও ট্যাক্সসহ অন্যান্য আদায়কৃত টাকা
১৮২১	২,৬৬,০০০
১৮৩৬	৩,৪৩,৩০০

১৮৫০	৩,৭৫,০০০
১৮৭৫	২১,৫৫,৫৬০
১৮৭৮	২৫,৪৩,২১৬
১৮৮১	২৬,৫০,৩৫০

বৃটিশ শাসনে এ ধরণের অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রা দিনে দিনে বেড়েই গেছে, এবং তা প্রধানত সম্ভব হয়েছে কর প্রয়োগের সর্বনাশা নীতি রূপায়ণের মাধ্যমেই।

সেকালে বর্ণগত পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের স্বাধীন বৃত্তি থেকেও কর আদায়ের চেষ্টা হয়েছে। এই কর ব্যবস্থার হাত থেকে কোন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ই রেহাই পায়নি। ১৮৭৯ সালে ক্ষৌরকর্মীদের উপরেও ১২৲ টাকা হারে লাইসেন্স ফি ধার্য করে ইংরেজ তার অর্থনীতিকে পুষ্ট করতে চেয়েছে। কিন্তু নরসুন্দর সমাজ এই করনীতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাঁরা এই কর আরোপের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। তাঁদের কাছে পাল্কিবেয়ারা, গাড়োয়ান এবং রজক ধর্মঘটের ইতিহাস অজানা ছিল না। তাঁরা সেই পথেই অগ্রসর হয়ে জগন্নাথ ঘাটের সমাবেশে জমায়েত হয়েছিলেন। তাঁরা দু-দফার দাবির সঙ্গে ১২টাকা লাইসেন্স ফি বন্ধ করার জন্যে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন।

নরসুন্দর সমাজের এই ধর্মঘটের ইতিহাস 'সুলভ সমাচার' নামক একটি পত্রিকার পাতায় ধরা আছে। পত্রিকাটি সেদিনের সমাবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছে: 'সেদিন জগন্নাথের ঘাটে নাপিতদের এক প্রকাণ্ড সভা হয়। সভাস্থলে সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছে যে প্রতি মাথার চুল ছাটা এক আনা ও দাড়ি কামান দু পয়সা; এখন দুপয়সা আর এক পয়সা আছে। শুনিলাম হিন্দুস্থানী নাপিত অনেক জুটিয়াছিল। এক পয়সায় সর্বাঙ্গ কামাবে আবার হাত পা বেশ ঘণ্টাখানেক টিপিয়া দিবে। এক পয়সায় আর কত করিবে। তবে বাজার করা ও জল আনাটা বাকি থাকে কেন? যে রূপ দ্রব্য সামগ্রী দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাহারা ও কথা সহজেই বলিতে পারে। ইহার উপর লাইসেন্স্ ট্যাক্সের হাঙ্গামা। একজন নাপিতের দিন গুজরান হইয়াই ভার, তার উপর আবার প্রতি জনকে বৎসরে ১২ টাকা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইলে আর গরিবেরা পারিবে কেন। একজন নাপিত প্রতিদিন কতই বা রোজগার করে। আমরা যদি বলি যখন নাপিতেরা ধর্মঘট করিল তখন বাবুরাও ধর্মঘট করুন যে আমরাও আর দাড়ি কামাব না

ঘরে ঘরেই ও কাজটা সারিব'।[১২]

বাঙলার দেখাদেখি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘটের ঢেউ উঠতে থাকে। ১৮৬৩ সালে বোম্বাই শহরের তিন হাজার নরসুন্দর তাঁদের ন্যায্য দাবি-সনদের ভিত্তিতে ধর্মঘট পালন করে এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেছিলো।[১৩]

ঘ ॥ গোপ ধর্মঘট

আগেই বলেছি ইংরেজ সরকারের জুলুম ও কর-নীতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং বেতন বৃদ্ধি কিংবা মূল্যবৃদ্ধির জন্যেই শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ ধর্মঘটের মধ্য দিয়েই সংগঠিত হয়েছেন। বিশেষ করে ইংরেজ সরকার যন্ত্র-তন্ত্র এবং যার তার উপর করের বোঝা চাপিয়ে দিতে থাকলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষেরা ট্যাক্সের সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত হয়েছেন। এমন কি সাধারণ ঘটনার ক্ষেত্রেও 'ধর্মঘট' তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে।

কলকাতার গোপ ও মোদকদের নিজস্ব ঘরোয়া বিবাদেও ধর্মঘট কি ভাবে দুটি শ্রেণীকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে তুলেছিল, তা একালের সংগ্রামী মানুষদেরও বিস্ময় সৃষ্টি না করে পারে না। ঘটনা সামান্যই মাত্র। কিন্তু দু-পক্ষের ধর্মঘটের ফলে দুপক্ষ ক্ষতির শিকার হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় 'মোদকেরা পূর্বে গোপদিগের নিকট হইতে গামছা বদ্ধ ছানা ওজন করিয়া লইত তাহার জলাংশ বাদ দিত না, পরে তাহারা ছানার বন্ধন খুলিয়া তাহার মধ্যে ভাগ কাটিয়া জল বাদ দিয়া ওজন করণের নিয়ম করাতে গোপগণ বিলক্ষণ ক্ষতি বোধ করিয়া একেবারে পরস্পর ঐক্য হইয়া ধর্মঘট করিয়াছে যে মোদক-দিগকে ঐ রূপ ছানা বিক্রয় করিবেক না। এবং মোদকেরাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, জল বাদ না দিলে গোপদিগের ছানা ক্রয় করিবেন না।'[১৪] কলকাতায় গোপ ও মদকের ধর্মঘট বেশ কিছুদিন ধরেই চলেছিল। দু-পক্ষই কম বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিজেদের প্রতিজ্ঞায় ঐক্যবদ্ধ ছিলেন।

এ ধরণের ধর্মঘট সে-কালের সমাজে ঘনঘন সংগঠিত হয়েছে। ধাঙড় ধর্মঘট, মাদ্রাজের মাংস বিক্রেতাদের ধর্মঘট, কলকাতার মোট বাহকদের ধর্মঘট ও জলভারীদের ধর্মঘটের প্রভাব পরবর্তী কালের শ্রমজীবী মানুষকে উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত করার পক্ষে ছিলো যথেষ্ট। বৃটিশ আমলেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে

যেমন মৌল পরিবর্তনের সূচনা ধরা পড়ে ; তেমনি এই মৌল পরিবর্তন ব্যক্তি স্বাধীনতার মধ্যেও বিমূর্ত হয়ে ওঠে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'জাতি বর্ণগত বৃত্তির আলোচনায় আমাদের সমাজ যুগ যুগ ধরে বন্দী হয়েছিল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির কর্ম বা বৃত্তি নির্বাচনের স্বাধিকার ছিল না, কুলগত বৃত্তির মধ্যে, গিল্ডের কঠোর অনুশাসন মেনে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্ম-জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে হত। ইংরেজদের শাসননীতি ও বাণিজ্যকর্মের সংস্পর্শে এসে এদেশের লোক এই কুলবৃত্তির বন্ধন থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হতে থাকে। শিক্ষা ও অর্থের সামাজিক মর্যাদা যখন সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আধুনিক সমাজে স্বীকৃত হতে থাকে, তখন কৌলিক মর্যাদার দীপ্তিও লোক চক্ষে ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে আসতে থাকে। সমাজের নতুন স্তরবিন্যাসে মানুষ নতুন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হতে থাকে– মজুর মধ্যবিত্ত ধনিক ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্য শূদ্র ইত্যাদি কুলগত স্তরভেদ ক্রমে শিথিল হতে থাকে। এই নতুন শ্রেণীবদ্ধতার ফলে সমাজে অর্থনৈতিক সংঘাত ও সংগ্রামের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।'[১৫]

ঙ ॥ তন্তুবায় ধর্মঘট

ভারতবর্ষের প্রাচীন অর্থনীতির বুনিয়াদ ব্রিটিশ রাজশক্তির শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। এদেশের চিরাচরিত জীবন যাত্রায় ফাটল ধরাতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। ভারতের কুটির শিল্পীকে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ শোষণের ভিতর দিয়ে ব্রিটিশ শাসক তার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে বজায় রাখতে চেয়েছে। ব্রিটিশ বেনিয়ারা অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই ভারতকে কাঁচা মালের উৎপন্নক্ষেত্রে এবং ইংলণ্ডকে সেই কাঁচা মাল দ্বারা উৎপন্নের পণ্যসামগ্রীর শিল্পভূমিতে পরিণত করার কৌশল অবলম্বন করে। যা ভারতীয় কুটিরশিল্পে ও ভারতীয় কৃষকদের জীবনে এক চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। ভারতবর্ষ থেকে কমদামে কাঁচা মাল সংগ্রহ করে ইংলণ্ডে তা নিয়ে গিয়ে, সেই কাঁচা মাল থেকে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী আবার ভারতবর্ষের বাজারে চড়াদামে বিক্রি করার মধ্যে নিজেদের অর্থনীতিকে স্ফীত করে তোলাই ছিল তাদের নীতি। এই শোষণের প্রশ্নে গোটা ভারতবর্ষটাই তারা তাদের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

কোম্পানীর শাসন কালের সূচনা লগ্ন থেকেই ইংরেজ ব্যবসায়ীর লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে ভারতের সূতী ও রেশম শিল্পের উপর। সূতী শিল্পের সঙ্গে জড়িত

তন্তুবায় শ্রেণীর উপর শোষণেব শ্যেন দৃষ্টি ছিল ইংরেজ কোম্পানীর। এদেশের তাঁতীদের স্বাধীন জীবিকার উপর ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ, ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ডেকে আনে এক চরম বিপর্যয়। আমরা জানি দেশীয় তাঁতীরা স্বাধীনভাবে জামা কাপড় তৈরি করে বংশ পরম্পরায় জীবিকা অর্জন করেছে। কিন্তু ইংরেজ বণিককুল এদেশের বংশগত কুটিরশিল্পগুলিকে ধ্বংস সাধনে মনোযোগ দিলে ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতির মূল কাঠামোটি ভেঙে পড়ে।

এদেশের কুটির শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে। তারা তাঁতীদের দাদন দিয়ে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী হস্তগত করে নগর বা শহরাঞ্চলে বিক্রির মধ্য দিয়ে জীবিকা অর্জনের পথ অনুসন্ধান করেছে। বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে দাদন ব্যবস্থার অত্যাচার ছিলো সবচেয়ে বেশী। কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশী দিন চলে নি। নবাবী আমলেই তা বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজ বণিকেরাই আবার এই দাদন ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে কুটিরশিল্পজাত পণ্যগুলিকে হস্তগত করার প্রেরণা খুঁজে পায়।

১৭৫৭ সালে ইংরেজ শাসন পাকাপাকিভাবে রাজনৈতিক অধিকার দখল করলে ভারতীয় তাঁতীদের উপর শোষণের হাতটি আত্মপ্রকাশ করে। বণিকেরা তাঁতীদের সঙ্গে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হতেন, পরে সেই চুক্তিগুলি ভঙ্গ করে নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণের চেষ্ট করতো। নামমাত্র মূল্য দিয়ে তারা কাপড় সংগ্রহের চেষ্টা বরাবরই করেছে এবং সেই সঙ্গে তাঁতীদের উৎপাদন ব্যয়ের অপেক্ষা কম মজুরী দিয়ে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী আদায় করার প্রবঞ্চনার নানা রকম কৌশল প্রয়োগ করে নিজেদের অর্থনীতিকেই চাঙ্গা করতে চেয়েছে। শোষণ-নিপীড়নের প্রথম বলি হয়েছে এদেশের কুটির শিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের মধ্যে তন্তুবায় শ্রেণীর লোকেরাই। দেশীয় বয়ন-শিল্পের সামগ্রিক শোষণ শুরু হয়েছিল ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর একচেটিয়া মূলধন সংগ্রহের ভিতর দিয়েই। এই শোষণের চিত্রটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদের বিবৃতির মধ্য দিয়েই পরিষ্কার হয়ে ওঠে ইংরেজদের শোষণ ক্রিয়ার নির্মম নিষ্ঠুরতা। 'আমরা যে অতুল ঐশ্বর্যলাভ করিয়াছি, উহা অত্যন্ত নৃশংস এবং ইতিহাসে বিরল-অত্যাচার

ও অনাচার করিয়া এবং ভারতের বুকে বসিয়া জোর করিয়া উহা আদায় করিয়াছি।'[১৬] এ হেন তথ্য ও তত্ত্বের মর্ম উপলব্ধি করতে ভারতবাসীর খুব একটা বিলম্ব ঘটে নি। বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত তাঁতীদের কিভাবে অত্যাচার অনাচার নিপীড়ন ও উৎপীড়নের মুখোমুখী হতে হয়েছে তার দৃষ্টান্ত নেহাৎ কম নয়। নিম্নে বর্ণিত ঘটনা সমূহের জন্যেই এদেশের তন্তুবায় শ্রেণী প্রতিরোধ সংগ্রামের বিষয়টি ভাবতে বাধ্য হয়:

[১] তাঁতীদের স্বাধীনভাবে কাজ না করতে দেওয়া।

[২] বস্ত্র উৎপাদন করতে বিলম্ব হলে বেত্রাঘাতের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা।

[৩] ইচ্ছেমতো উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণ।

[৪] বাজার দর অপেক্ষা কমমূল্যে কাপড় দিতে বাধ্য করা।

[৫] এছাড়া জেল, জরিমানা, মুচলেখা প্রভৃতির প্রয়োগ ছিল অতি সাধারণ ঘটনা।

অত্যাচার লুণ্ঠনের দায়ে লর্ড সভায় হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগের কালে এণ্ডমাণ্ড বার্ক বলেন যে: 'কোম্পানীর লোকেরা ভারতীয় শিল্পীদেব হাতের আঙ্গুলগুলি এরূপ নিষ্ঠুরভাবে দড়ি জড়াইয়া বাঁধিত যে, প্রত্যেকের হাতের মাংসগুলি একত্রিত হইয়া দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন ও সংবদ্ধ হইয়া যাইত। তৎপর উহারা কাষ্ঠের বা লোহার গোঁজ হাতুড়ি দ্বারা ঐ সংবদ্ধ আঙ্গুলগুলির মধ্যে বিদ্ধ করিয়া দিত। নিষ্পেষিত হইয়া হাতগুলি এরূপ বিকলত্ব প্রাপ্ত হইত যে হতভাগ্য নিরীহ এবং শ্রমশীল তাঁতীরা আর ইহ-জীবনে ঐ হাত দ্বারা কোন কিছু ধরিয়া মুখে তুলিতেও সমর্থ হইত না'।[১৭] এমন উৎপীড়ন ও নিপীড়ন বেশীদিন সহ্য করতে না পেরে, বাধ্য হয়েই তন্তুবায় সম্প্রদায় প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বৃহত্তর সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। তাঁতীরা সংঘবদ্ধভাবে অসহযোগ ও ধর্মঘট আন্দোলনের পথকেই বেছে নেয়। বিশেষ করে, বাঙলাদেশের নদীয়া জেলার শান্তিপুরের তাঁতীদের সংঘবদ্ধ ধর্মঘট ও গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নবচেতনার দ্বার উদ্ঘাটন করে। এবং তাঁতীরা স্বাধীনভাবে গোপনে ব্যবসা চালাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে ইংরেজ বণিকেরা তাঁতীদের ওপর নানা রকম নির্যাতন শুরু করে। তাঁতীরা এরপর আর চুপ করে বসে থাকতে পারলো না। তাদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রেরণা এতই প্রবল আকার ধারণা করে যে তারা শঙ্খ ধ্বনি করে

একটা পূর্ব-নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হয়। এবং ঐ গোপন সমাবেশে তারা আগামী দিনের ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। শান্তিপুর কেন গোটা বাঙ্‌লাদেশ জুড়েই এ-যুগের ট্রেড-ইউনিয়নের প্রেরণা, সে যুগেই সূচিত হয়েছে তন্তুবায় শ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। তারা আন্দোলনের প্রথম থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলো, বস্ত্র উৎপাদন বন্ধ রাখার জন্যে। উৎপাদন ব্যবস্থা বন্ধ করার, এমন কি মিছিল করে কলকাতায় যাওয়ার ঘটনাও সেকালের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

এ সময়ে তন্তুবায়দিগের ব্যাপক গণ সংগ্রামই ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়নের সম্ভাবিত অঙ্কুর সূর্যের তাপ পেতে শুরু করে। এই উত্তাপে ভারতীয় কুটির শিল্পের অন্যতম ; বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ইংরেজ কোম্পানীর শোষণের শর্তগুলি অস্বীকার করার মত সাহস অর্জন করে। তন্তুবায়দের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনের কাছে কোম্পানীর সকল রকম কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙ্‌লাদেশের বিভিন্ন বয়ন শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে হুগলী ও নদীয়া জেলার তাঁতীদের বীরত্ব পূর্ণ সংগ্রাম সংগঠিত হয় বিশেষ কয়েকজনের চেষ্টায়। এঁদের মধ্যে দুনিরাম পাল,নয়ন নন্দী, লোচন দালাল, রামরাম দাস প্রমূখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে হুগলী জেলার হরিপাল কেন্দ্রের অধীন দ্বারহাট্টা শাখা-কেন্দ্রের তন্তুবায়গণও কেন্দ্রের 'রেসিডেন্ট'কে স্পষ্টভাবে জানাইয়াছিল যে তাহারা কোম্পানীর জন্য আর বস্ত্র তৈয়ার করিতে পারিবে না। 'রেসিডেন্ট'বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদের সেই সংকল্প ও ঐক্য ধ্বংস করিতে পারেন নাই।"[১৮] "তন্তুবায় শ্রেণীর ঐ ঐক্য-বদ্ধ সংকল্পই ভারতবর্ষে 'ট্রেড-য়ুনিয়ান' আন্দোলনের মত অসহযোগ, ধর্মঘট প্রভৃতির রূপে দেখা দিয়াছিল।"[১৯] এবং এখান থেকেই ধর্মঘট আন্দোলনের পথ-পরিক্রমার শুরু। অবশ্য এই শুরুর ইতিহাস সঠিক ধর্মঘট আন্দোলন হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি ; তবু ধর্মঘটের প্রাক-পর্বে এর গুরুত্ব অপরিসীম ও নিঃসন্দেহে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

চ ॥ মালঙ্গী ধর্মঘট

ভারতে লবণের ব্যবহার বহুদিনের। সেকালে ভারতের মধ্যে মেদিনী-পুরের লবণের উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না। তখন গ্রামের কৃষকরাই চাষ-বাসের অবসরে লবণ তৈরির কাজে নিযুক্ত থাকতেন। সমুদ্র

তীরবর্তী অঞ্চলের লবণাক্ত জল শুকিয়ে লবণ তৈরি হতো। লবণ কুটির শিল্প হিসাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেদিনের মেদিনীপুরের হিজলী ও তমলুক অঞ্চলের উৎকৃষ্ট লবণ বাঙলার বাইরের বহু বণিক কিনে নিয়ে গিয়ে লক্ষপতি হয়েছেন। সে সময়ে লবণ প্রস্তুতকারীদের কাছ থেকে কোন রকম রাজস্ব সংগ্রহ করাও হোত না। বরং লবণ উৎপাদনকারী কৃষকদের নানারকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

সেকালে লবণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারী বা কারিগরদের 'মালঙ্গী' নামে অভিহিত করা হোত। কিন্তু এই মালঙ্গীদের জীবন খুব একটা সুখের ছিল না। এ ক্ষেত্রেও ইংবেজ বেনিয়াদের লাভালাভের বৃদ্ধি তাদের দুঃখের কারণ হয়েছে। বিনা শুল্কে অবাধ লবণ ব্যবসার একচেটিয়া সুবিধা লাভ করে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী। এরাও নীলকর অত্যাচারের ন্যায় লবণ শিল্প-ভুক্ত মালঙ্গীদের ওপর অত্যাচাব শুরু করে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিনা শুল্কে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার অর্জন করলে, কোম্পানীর কর্মচারিগণ ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে 'ট্রেডিং এসোসিয়েশন' নামে একটি সুবিধাভোগী বণিকসভা তৈরি করেন। তারা এই বণিক সভার মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে লবণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিধি-নিষেধ জারি করে বলেন যে, এ দেশে যত লবণ উৎপন্ন হবে তার প্রতি পাঁচশত মণ ৫ টাকা হিসাবে ইংরেজ বেনেদের কাছে বিক্রি করতে হবে। পরে বণিক সভা পাঁচ টাকা মূল্যে দেশীয় মহাজনদের বিক্রি করবে। এই মহাজনেরাই আবার লাভ-লোকসান বুঝে জন সাধারণের কাছে খোলা বাজারে ঐ লবণ বিক্রি করবেন। এমন কি দেশীয় মহাজনেরা বণিক সভাকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি মালঙ্গীদের কাছ থেকে লবণ ক্রয় করতে পারবে না।[২০] এ বিষয়ে বণিক সভার কাছে মালঙ্গীদের মুচলেখা দিতেও হয়েছে। বণিক সভার এই সব অন্যায় বিধি-নিষেধে মালঙ্গীদের জীবনে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসে।

অবশ্য ইংরেজ বণিকের এই জোর জুলুম বেশি দিন চলেনি। পরে লণ্ডনস্থ কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের বিরুদ্ধতায় বণিক সভার এক চেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যবসায় লক্ষ-লক্ষ টাকা উপার্জিত হয়েছে, সে ব্যবসা তো সহজে ছাড়া যায় না। তারা কোম্পানীর নিষেধকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আগের মতোই ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যেতে থাকে। এ-

প্রসঙ্গে তৎকালীন গর্ভণর জেনারেল ভেরেলাস্ট-এর উক্তি থেকে জানা যায়: "কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীগণই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী হিসাবে দেশীয় মহাজনের দ্বারা লবণের ব্যবসা চালাতে থাকে।"[২১] ফলে বেনামে ব্যবসা চালানোর বিরুদ্ধেও লণ্ডন থেকে বাধা-নিষেধের বহু নির্দেশ আসতে থাকে। কিন্তু সেই সব নিষেধাজ্ঞাই বানচাল হয়ে যায় বুদ্ধির মার প্যাঁচে। বণিক সভা লণ্ডনের কর্তাদের খুশী করার জন্যে একটি উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁরা কর্তাদের জানান যে, তাঁরা যত লবণ বিক্রয় করবে তার উপর শতকরা ৩৫ টাকা হিসাবে মাশুল কোম্পানীকে দেবেন। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন।

১৭৬৬ সালেই একমাত্র লবণের মাশুল থেকে ১৩ লক্ষ টাকা কোম্পানীর আয় হয়েছিল বলে জানা যায়। কোম্পানীর বণিক সভা কর্তৃক মাশুল বাবদ ভালো রাজস্ব পাওয়ার লোভে ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ৩-রা জুন একটি আইনের দ্বারা দেশের জনসাধারণ তথা মালঙ্গীদের পক্ষে লবণ প্রস্তুত নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করেন। এই আইন বলবৎ হওয়ার পর থেকেই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ প্রতি বছর কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার একটি পরিসংখ্যান এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত আদায়ীকৃত লবণ শুল্কের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল:[২২]

বৎসর				শুল্ক বাবদ রাজস্বের পরিমাণ
১৭৮০	"	"	"	৪০০০০০০ টাকা
১৮১০	"	"	"	১১৭২৫৭০০ টাকা
১৮১২	"	"	"	১২০০০০০০ টাকা
১৮২১	"	"	"	১২৮৪০৮০০ টাকা
১৮২৬	"	"	"	১৫৮৮৬০০০ টাকা
১৮২৯	"	"	"	২৫৮২০০০০ টাকা

কোম্পানীর আমলে লবণের দাম এতো বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে এদেশের লোকেরা লবণ ব্যবহার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। চালের দামের চেয়ে লবণের দাম ১২ গুণ বৃদ্ধি পায়। লবণের মাশুল বৃদ্ধিই এই দাম বাড়ার প্রধান কারণ।

লবণের দাম বৃদ্ধি হলো, অথচ লবণ উৎপাদনকারী মজুরদের তেমন

কোন আর্থিক উন্নতি ঘটলো না। বরং ইংরেজ বণিকের অবাধ শোষণ ও বঞ্চনায় কারিগরদের অবস্থা দিন দিন দুঃসহ হয়ে উঠলো। বিশেষ করে তমলুক ও হিজলী অঞ্চলের লবণ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে নির্যাতন চরমে ওঠে। তাদের দৈনিক মজুরী এতই কম ছিল যা দিয়ে সংসার প্রতিপালন করার সাধ্য তাদের ছিল না। অবসর সময়ে দিন মজুরের কাজ করতেও হয়েছে মালঙ্গীদের। এদের আর্থিক দুরবস্থা বিষয়ে বণিক সভার কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না। বরং বেশী পরিমাণে লবণ উৎপাদন করার জন্যে বাধ্য করা হয়েছে তাদের। এই অত্যাচারের ফলে অনেক সময় তারা পালিয়ে বাঁচার পথ খুঁজেছে। কিন্তু পালিয়েও তাদের মুক্তি নেই। কারণ কোন মালঙ্গী পালিয়ে গেলে ইজারাদাররা ফৌজদার ও পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাদের খুঁজে বের করে আবার পূর্বতন কাজে নিয়োগ করতেন।

এ ধরণের অত্যাচারে জর্জরিত মালঙ্গীরা যে ভাবে প্রাণ ধারণ করতেন, তার বহু দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে হিজলী, তমলুকের নিমক মহলের ভিতরে ও বাইরে। ১৮২৯ সালের ১৯ শে সেপ্টেম্বর 'সমাচার দর্পণ' থেকে জানা যায় যে, 'হিজলী ও তমলুকের নিমক মহালে ১৩৩৮৮ পরিজন সমেত 'আজেজারা' [যে সব কুলিদের বিনা পারিশ্রমিকে লবণের কার্যে বেগার খাটিয়ে নেওয়া হোত] মালঙ্গীরা আছে এবং তাঁহারা দুই তিন বৎসরাবধি এইরূপ ক্লেশ পাইতেছে।' এই অঞ্চলের মালঙ্গীদের শারীরিক ক্লেশ আরও বৃদ্ধি পায়। পাইক-পেয়াদাদের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। ইজারাদারদের উৎপীড়ন-নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে মালঙ্গীরা দলে দলে কারখানায় অনুপস্থিত থেকেছে। বর্তমান কালের ধর্মঘট আন্দোলনের মতই সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে।

১৭৯৩ সাল থেকেই মেদিনীপুরের নিমক মহালের মালঙ্গীরা জমিদার, ইজারাদার পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সংঘবদ্ধ হয়ে কারখানার কাজ বন্ধ করে দিয়ে পালিয়ে গেছে। পালিয়ে গিয়ে তারা কোম্পানীর শাসনের ও শোষণের বিরুদ্ধে মালঙ্গী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সংগঠিত করে তোলে। বিক্ষোভে মালঙ্গীরা ফেটে পড়ে। তাদের বিক্ষোভের চূড়ান্ত প্রকাশ একটা গণআন্দোলনের আকার লাভ করতে থাকে। মালঙ্গীদের এই আন্দোলন মেদিনীপুর সহ গোটা বাঙলা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বলাই বাহুল্য মালঙ্গীদের প্রতিবাদ একটি রাজনৈতিক চেতনারই উন্মেষ ঘটায়। দীর্ঘকালের জমে থাকা ক্ষোভ জ্বলে ওঠে ১৮০০ সালের এপ্রিল

মাসের দিকে। তাঁরা বিক্ষোভ জানাতে বিভিন্ন নিমক-মহাল থেকে এসে এক স্থানে সমবেত হয়ে কাঁথি পর্যন্ত মিছিল করে। মিছিলে কাঁথি সন্নিহিত অঞ্চলের মাঙ্গলীরাও যোগ দেয়। তারা একটি সভায় মিলিত হয়ে একটি দাবি সনদ তৈরি করে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই মালঙ্গী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বলাই কুণ্ডু নামক এক ব্যক্তি। তিনিই মালঙ্গী সমাজকে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করেন। তিনি সভায় পঠিত দাবিপত্রে কোম্পানীর নিকট লেখেন যে, বাজারে উচ্চ মূল্যে লবণের বিক্রয় নিষিদ্ধ করতে হবে। বেগার ও ভেট প্রথার অবসান ঘটাতে হবে। এই সব দাবি কলকাতায় তারা যথাস্থানে ঠিকই পৌঁছে দেয়। কিন্তু প্রশাসন মালঙ্গীদের দীর্ঘ দিনের এই বাস্তব অভিযোগগুলির প্রতিকার কল্পে কোন ব্যবস্থা নিতে চায়নি। আবেদন করা সত্ত্বেও কোন প্রতিকার হয়নি। সহজে তাঁদের সমস্যার সমাধান না হওয়ার ফলে তাঁরা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের পথকেই বেছে নেয়। তাঁরা এ ক্ষেত্রে ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে একালের ধর্মঘটের মতোই কর্মসূচী গ্রহণ করে, তাঁদের আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে তোলেন। মালঙ্গীরা 'কোম্পানীর লবণ কারখানার সমগ্র পরিচালন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।'[২৩] মালঙ্গীদের এই ধর্মঘট আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন প্রেমানন্দ সরকার নামে এক ব্যক্তি। এতদিন বিক্ষোভ বিদ্রোহ, প্রতিবাদ কোন কিছুই লবণ কারখানার সমগ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু প্রেমানন্দ সরকারই একমাত্র ব্যক্তি যিনি লবণের কারখানায় ঘুরে ঘুরে ধর্মঘট পালন করার জন্যে মালঙ্গীদের উদ্বুদ্ধ করেন। দলে দলে এই ধর্মঘটের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মালঙ্গীরা তাদের দীর্ঘদিনের শোষণ ও পীড়নের অবসান ঘটায়। এ ক্ষেত্রে মালঙ্গীদের আন্দোলনের উৎস-ইতিহাস হিসাবে জোলা, তাঁতী, মালঙ্গী প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষেরা আগামী দিনের যথার্থ ধর্মঘটগুলিকে পুষ্ট করতে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা রেখে যায় ও যা ভারতের ধর্মঘটের প্রথম যুগের প্রাথমিক ইতিহাস। যদিও এ ইতিহাস ছিল আন্দোলনের ইতিহাস এবং এগুলি ছিল কৌশলহীন বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের প্রতীক মাত্র। যার ফলে এ সময়ের ধর্মঘটগুলি ধর্মঘট হিসাবে ইতিহাস হয়ে উঠতে পারেনি। বরং এই সব খণ্ড-বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলিই পরবর্তীকালে শ্রমজীবী মানুষদের ধর্মঘট আন্দোলনের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। বলাই বাহুল্য তৎকালীন

ইংরেজ সরকার ও তার অনুগত ব্যবসায়ী, জমিদার, মহাজন শ্রেণীর অত্যাচার অনাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রথম কুটির শিল্পের কারিগরদের মধ্য থেকেই গণ অভ্যুত্থান ও গণ-সংগ্রামগুলি ঘটে। কিন্তু বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলি সমাজের সার্বিক দিক থেকে সহযোগিতা না পাওয়ার জন্যেই, হয় তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে, নয়তো কখনো আংশিক সাফল্য লাভে সমর্থ হয়েছে। ইতিহাসের অন্ধকারে পড়ে থাকা প্রগতিবাদী গণবিদ্রোহের বৈপ্লবিক ভাবধারার ইতিহাস এখান থেকেই শুরু। যে শুরুর মধ্য দিয়েই এ দেশের বিদ্রোহের ব্যাপক প্রসার ঘটে। যে বিদ্রোহ থেকে জন্ম নিয়েছে আগামী দিনের ধর্মঘট আন্দোলনের ব্যাপক প্রস্তুতি পর্বের বিচিত্র ইতিহাস।

ছ। নাবিক ধর্মঘট

আমাদের দেশে নৌকার প্রচলন বহু প্রাচীন। নৌকার প্রাচীনতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীনকালে দেশ থেকে দেশান্তরে গমনা-গমনের একমাত্র বাহন ছিল নৌকাই। স্থল পথের চেয়ে জল পথে যাতায়াতের খরচ যেমন কম ছিল, তেমনি আরামদায়কও ছিল। সবদিক থেকে যাওয়া-আসার সুবিধার জন্যে নৌকার চাহিদা কম ছিল না। বরং হিসেব মতো নৌকাই ছিল জনপ্রিয় বাহন। রাজা, প্রজা, বাদশা-ফকির সকলেরই কাছে নৌকার কদর ছিল সমান। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৌকাকে বাদ দিয়ে কোন বণিকই পণ্য বহনের চিন্তা করতে পারতেন না। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বাণিজ্য-ক্ষেত্র পর্যন্ত নৌকা ছিল অপরিহার্য। ইতিহাসের নৌযুদ্ধই তো নৌকার প্রয়োজনীয়তাকে আজো স্মরণ করিয়ে দেয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যে নৌকার গতিমুখের সুন্দর বর্ণনা ধরা পড়েছে এইভাবে :

> 'ত্বরায় বহিছে তরি তিলেক না রয়।
> চিৎপুর সালিখা সে এড়িয়া যায়।...
> বালুর ঘাট এড়াইল বেনের নন্দন।
> কালিঘাটে গিয়া ডিঙি দিল দরশন।'[২৪]

ষোড়শ শতকে রচিত দ্বিজ মাধবাচার্যের রচিত 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' গ্রন্থেও ধনপতি সদাগরের সিংহল অভিমুখে যাত্রার বর্ণনাতেও নৌকা বেয়ে যাওয়ার বর্ণনা ধরা আছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও নৌকাযোগে গোটা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। ১৬৩০ সাল নাগাদ সাজাহান উড়িষ্যা থেকে ফেরার পথে সপ্তগ্রাম দেখার জন্যে সরস্বতী নদীর

অববাহিকা ধরেই নৌকাযোগে এসেছিলেন বলে জানা যায়।[২৫] দেশ-বিদেশের বণিকরা নৌকার সাহায্যেই মাল-পত্র আমদানী-রপ্তানী করতেন। নৌকা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা ভাবাই যেত না। যোড়শ শতকে বারবোসা নামক জনৈক পর্যটক ভারতের নৌকা দেখে লিখেছিলেন যে, এদেশের সমৃদ্ধশালী বণিকের দল মক্কাদেশীয় নৌকার ন্যায় অনেকগুলি নৌকার অধিকারী। এই সকল নৌকাযোগেই বণিকগণ করমণ্ডল, মালাবার, কাম্বে, পেগু, সুমাত্রা, সিংহল ও মালাক্কায় গমনাগমন করেন।[২৬] পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুরা নৌকা বোঝাই করেই ক্রীতদাসদের বাজারে বাজারে চালান দিতেন। সেকালে নৌকার কল্যাণেই দেশে দেশে যেমন বাণিজ্যিক বন্দর গড়ে উঠেছিল তেমনি-বিশিষ্ট জনপদগুলি গড়ে ওঠার মূলে নৌকার অবদানই ছিল বেশী। নৌকা যোগাযোগের সরল মাধ্যম হওয়ার ফলে আমাদের গাঙ্গেয় সভ্যতাও গড়ে উঠতে পেরেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর যন্ত্র সভ্যতার কালেও নৌকার সেই সুবর্ণ যুগ শেষ হয়নি। মানুষ-চালিত দাঁড়বাহী কাঠের নৌকা এই সেদিনও বিত্তবান লোকদের বহু প্রয়োজন মিটিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে, ভ্রমণে, যুদ্ধে এমনকি উৎসবেও নৌকা নানাভাবে সেকালের মানুষের চাহিদা পূরণ করেছে।

ঠাকুরবাড়ীর পূর্ব পুরুষেরা গোবিন্দপুরে মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গেই কাল কাটিয়ে গেছেন। আর সেই গোবিন্দপুরের নৌকার মাঝি-মাল্লারাই ঠাকুরবাড়ীর আদি বংশপরিচয়টির উচ্ছেদ ঘটিয়ে ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের আদি পদবী অস্তমিত হয়েছিল কলকাতার নৌকার মাঝি-মাল্লাদের দৌলতেই। ঠাকুরবাড়ীর আদি পদবী 'কুশারী'-কে পাল্টানোর পিছনে মাঝি-মাল্লাদেরই তো অবদান। ইংরেজরা এদেশে এসে বসবাস শুরু করলে প্রাচীন গোবিন্দপুর আর এক অন্য গোবিন্দপুরে পদার্পণ করছিল। সে সময়ে অনেক বাঙালী বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীর কৃপা লাভে ছুটে এসেছিল গোবিন্দপুরে। ঠাকুর পরিবারের পূর্বতন দুই পুরুষ শুকদেব ও পঞ্চানন কুশারী জাহাজ ও নৌকার ব্যবসা করতে এসেছিলেন কলকাতায়। সেকালের নৌকার মাঝিমাল্লারা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে, তারা শ্রদ্ধা বশতঃ শুকদেব ও পঞ্চাননকে ঠাকুর মশাই বলেই সম্বোধন করতে শুরু করলে ধীরে ধীরে ঠাকুর, পরিচিতির আড়ালে তাঁদের বাপ-ঠাকুরদার 'কুশারী' পদবী ঢাকা পড়ে যায়।[২৭]

নৌকা সেকালে সব মানুষের কাছে সমান মর্যাদা পেয়েছে নানা ভাবে। রাণীরাসমণির কাশী যাওয়ার জন্যে একশোখানি নৌকা সারি সারি সাজানো হয়েছিল বলে জানা যায়।[২৮] নৌকা, যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেমন অল্প পয়সার যানবাহন ছিল, তেমনি নৌকায় চড়ায় আনন্দ ও কম বিলাসিতার ছিল না। ইংরেজ আমলে নৌকা চলাচলে দায়-দায়িত্ব ছিল পুলিশের উপর। পুলিশ বিভাগের অধীনের থাকার ফলে, দূরদেশে যেতে হলে পুলিশকে আগাম জানাতে হতো। নচেৎ যাওয়া যাবে না। পুলিশ বিভাগের নৌকায় যেতে হলে যাত্রী সাধারণকে যাতাযাতের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাড়াও গুণতে হয়েছে। ১৭৮১ সালের ১০ই মার্চের পুলিশের বিজ্ঞাপনে নদীপথে নৌকা ভাড়ার একটি তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছিল। এই হার নির্ধারিত হয়েছিল কলকাতার ঘাটগুলি থেকে:[২৯]

কলকাতা থেকে	সময়	নৌকার প্রকারভেদ	ভাড়া
বহরমপুর	২০ দিন	৮ দাঁড়	২৲ টাকা
মুর্শীদাবাদ	২৫ „	১০ „	২৷৹ „
রাজমহল	৩১ „	১২ „	৩৷৹ „
মুঙ্গের	৪৫ „	১৪ „	৫৲ „
পাটনা	৬০ „	১৬ „	৬৲ „
বেনারস	৭৫ „	২৮ „	৬৷৹ „
কানপুর	৯০ „	২০ „	৭৲ „
ফৈজাবাদ	১০৫ „	২২ „	৭৷৹ „
মালদহ	৩৭৷৹ „	২৪ „	৮ „
রঙ্গপুর	৫২৷৹ „	মালবোঝাই বোট	
ঢাকা	৩৭৷৹ „	২৫০ মণ	২৯৲ „
লক্ষীপুর	৪৫ „	৩০০ „	৩৫৲ „
চট্টগ্রাম	৬০ „	৪০০ „	৪০৲ „
গোয়ালপাড়া	৭৫ „	৫০০ „	৫৷৹ „

এতো গেল সরকারী নৌকার ভাড়া ও মাশুলের কথা। কিন্তু সেকালের মানুষ স্বাধীনভাবেও নৌকার উপর নির্ভর করে সংসার নির্বাহ করেছেন। জীবিকা হিসাবে নৌকার কাজ সেকালের নিম্নশ্রেণীর লোকজনেরাই করতেন। আর এই গঙ্গানদীর মাঝিদের সংগ্রামী জীবনের কথা সেকালের

সংবাদপত্রে ধরা আছে অন্য ভাবে। মাঝি-জীবনের দুঃখ কষ্টের দলিল নয়, মাঝি-জীবনের বাঁচার দৃঢ় প্রত্যয়টুকুই খুঁজে পাওয়া যায় উনিশ শতকের গঙ্গানদীর ডিঙ্গি নৌকার নাবিকদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মধ্যে।

জব চার্ণক কলকাতা বন্দরকে গড়ে তোলার প্রথম যুগে দেশ বিদেশের কত নৌকা যে আনাগোনা করতো তার ইয়ত্তা নেই। নৌকার মাঝি-মাল্লাদের কল-কাকলিতেই কলকাতার জনপদ জমে উঠেছিল ধীরে ধীরে। যে কলকাতা তিল থেকে তিলোত্তমা হতে পেরেছিল তা তো সেকালের নৌকার দৌলতেই। ছোট বড় ডিঙি নৌকার ভিড়েই কলকাতার আমদানী-রপ্তানীর বাণিজ্যিক চালচিত্রটি দিনে দিনে বিশাল আকার ধারণ করে। গঙ্গা পারাপার করার জন্যে ফেরী নৌকার তো অভাব ছিল না। এইসব ফেরী নৌকার মাঝি-মাল্লাদের স্বাধীন জীবিকায় কোন কালে কোন রাজশক্তি হস্তক্ষেপ করার অভিপ্রায় দেখান নি। কিন্তু ইংরেজ শাসনে নৌকার মাঝি-মাল্লাদের রুজি রোজগারে বাধ সাধলেন ভারতে বৃটিশ গবর্ণর। আয়ের পথ খুঁজতে যে কোন ক্ষেত্রে কর আদায় করতে তাঁদের কৌশল কম ছিল না। যে কোন ভাবে কর আদায় করাই ছিল তাঁদের শাসন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। করের এই উৎপীড়ন থেকে সেদিন রেহাই পায়নি গঙ্গানদীর ডিঙি নৌকার মাঝি-মাল্লারাও। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ বলে নৌকার মাঝি-মাল্লাদের কাছ থেকে কর আদায়ের ফতোয়া জারি করলেন। কিন্তু সরকারের এ সিদ্ধান্তে দেখা দিল যত রকম বিপত্তি। তারা সরকারী করনীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলেন গঙ্গানদীর সমস্ত মাঝিরা। তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মঘটে সামিল হলে এবং গবর্ণমেণ্ট নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলে, মাঝি-মাল্লারাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠতে বাধ্য হলেন নৌকা না চালানোতে। মাঝি-মাল্লাদের এই সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ঘটনা সেদিনের সংবাদপত্রেও স্থান করে নেয়। ১৮৫৬ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকাটি সেদিনের কলকাতার পার্শ্ববর্তী নদীর মাঝি-মাল্লাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের খবরটি ছাপে: "হাবড়ায় একশত নৌকা বন্ধ করিয়াছে। সাধারণে এতজ্জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন।"[৩০] সত্যিই তো সেদিন নৌকার মাঝি-মাল্লাদের ধর্মঘটে বাণিজ্যিক কলকাতার নাভিশ্বাস উঠেছিল। সেজন্যেই সংবাদপত্র জনসাধারণের কষ্ট বৃদ্ধির কথা প্রকাশ না করে পারেনি। কারণ সেকালের নৌকা ছাড়া বাণিজ্যিক-

কলকাতার কোন উপায়ই ছিল না।

জ। নমঃশূদ্র ধর্মঘট

ভারতীয় সমাজ গঠনে জাতিভেদ প্রথা অনড় থাকার ফলে, এদেশে বিভিন্ন জাতির জীবন যাত্রা এক বিচিত্র পথে পরিচালিত হতে বাধ্য হয়েছে। শাস্ত্রের বিচিত্র শাসন কোন সমাজই উপেক্ষা করতে পারেনি। গুণ ও কর্মের ভিত্তিতেই আমাদের সমাজে চারটি বর্ণের সৃষ্টি। গীতা কিংবা মহাভারতে গুণ ও কর্মের প্রশ্নকে সামনে রেখেই, বর্ণবিভেদ নির্ণীত হয়েছিল। নহুষ ও যুধিষ্ঠিরের কথাবার্তায় এমন দৃষ্টান্ত মেলে। সর্পরূপী নহুষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের লক্ষণ বিচারে বলেছেন,'সত্য, অনিষ্ঠুরতা, দান, ক্ষমা, তপস্যা ও দয়া যে ব্যক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি ব্রাহ্মণ।' যুধিষ্ঠিরের মুখে এ ধরনের উক্তি শুনে নহুষ পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'সত্য, দান, ক্ষমা প্রভৃতি গুণ যদি শূদ্রের মধ্যে দেখা যায়?' এর উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন: 'শূদ্রের জাতিগত গুণ [পরিচর্যা প্রভৃতি] যদি ব্রাহ্মণে দেখা যায়, তাহলে তাকে শূদ্র বলে স্বীকার করব। আর ব্রাহ্মণের গুণ [শম, দম প্রভৃতি] যদি শূদ্রে দেখা যায় তবে সেই শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলব।'[৩১] অর্থাৎ জন্মগত বা বর্ণগত শ্রেণী বিভাজনকে মেনে নেওয়া হয়নি মহাভারতের এই আখ্যায়িকায়। অথচ ভারতবর্ষের প্রাচীন বর্ণ ব্যবস্থায় জন্মগত অধিকারই মর্যাদা পেয়েছে। সেখানে কর্ম বা গুণগত বর্ণভেদের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান ব্রাহ্মণ, শূদ্রের ঔরসজাত সন্তান শূদ্র হিসাবেই বিবেচিত হয়ে আসছে। শূদ্রের সন্তান গুণ ও কর্মে যতই মেধাসম্পন্ন হোক না কেন, সে তার জন্মগত কুলবৃত্তি ত্যাগ করে অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারতো না। জন্মগত অধিকারই তাঁকে অন্য কোন শ্রেণীর সম-মর্যাদা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বাধ্য করেছে। এই বর্ণ বিভাজনই হলো প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক গঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

জন্মগত বৃত্তি পরিবর্তন করলে জাতি-চ্যুতি ঘটার আশঙ্কায় কোন সমাজই সহজে বৃত্তি পরিবর্তনে সাহস পেতো না। কারণ মনু তাঁর 'মেধাতিথি ভাষ্যে' এ বিষয়ে কতকগুলো নির্দেশ পালনের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: ১। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ও সম্পত্তি ব্রাহ্মণের। কারণ ব্রাহ্মণের সৃষ্টি ভগবানের মুখ থেকে। ২। বৈশ্য ও শূদ্র কতকগুলো বিশেষ কাজ করতে বাধ্য। কারণ এরা কাজ না করলে গোটা বিশ্বের অবস্থা চরমে পৌঁছাবে।

৩। ক্ষমতা থাকলেও, শূদ্রের সম্পদ সংগ্রহের কোন অধিকার নেই। শূদ্র সম্পদ সংগ্রহ করলে ব্রাহ্মণের কষ্ট বৃদ্ধি পাবে।[৩২]

এইসব শাস্ত্রীয় নীতি লঙ্ঘন করলে পরলোক সুখের হবে না ইত্যাদি শাস্ত্রীয় প্রবচন, নিম্নবর্ণের ক্ষেত্রে এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের একই অপরাধের ক্ষেত্রে সামাজিক দণ্ডবিধিরও তারতম্য ছিল। দুই বর্ণের সামাজিক শাস্তি একই ছিল না। ব্রাহ্মণের গুরু পাপে লঘু দণ্ড, শূদ্রের লঘু পাপে গুরুদণ্ড প্রযুক্ত হয়েছে। এই অসমনীতির ফলে শূদ্রেরা বরাবরই পদানত থেকেছেন—এটাই সেকালের বর্ণব্যবস্থার কুফল। এঁদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় নি ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার অসাম্য নীতি। অথচ ব্রাহ্মণদের এই বিভেদনীতিকে অন্যান্য বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায় মেনে নেয়নি। তাঁরা প্রয়োজনে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন এই সব অসম নীতি কিংবা অসঙ্গত জুলুমের বিরুদ্ধে।

জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথার নগ্ন রূপ সবচেয়ে বেশি করে ফুটে ওঠে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। নানা মত ও মতান্তরে জাতিভেদ বিষয়ে প্রশ্ন তোলে এদেশের নির্যাতিত অংশ। তাঁরা নানা ভাবে জাতিভেদ প্রথার মূলোচ্ছেদ-ঘটাতে চেয়েছেন। জাতিভেদ প্রথার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে বার বার প্রতিবাদ জানিয়ে জনমত গঠনেরও চেষ্টা চালিয়েছে এ দেশের এক শ্রেণীর মানুষ। রামমোহনের যুগ-থেকেই বর্ণভেদের বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেছে। এই প্রতিবাদের ফলে হিন্দুর সমাজ কাঠামোয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বর্ণভেদের বিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এই বিবর্তন মূলতঃ কর্ম ও গুণের ভিত্তিতেই ঘটেছে। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কালের সূচনা পর্যন্ত যে বর্ণ-বিবর্তন তা এই রকম :

১। বর্ণ বিভাজন [১ম যুগ]

১। ব্রাহ্মণ	২। ক্ষত্রিয়	৩। বৈশ্য	৪। শূদ্র

২। বর্ণ বিভাজন [২য় যুগ]

উত্তম সংকর	মধ্যম সংকর	অধম সংকর
[সৎশূদ্র]	[অশূদ্র]	[অন্ত্যজশ্রেণী]
[বৈদ্য, কায়স্থ, নাপিত, মোদক বারুজীবী, তাম্বলী, মালাকার কর্মকার, শঙ্খকার, তন্তুবায় কুম্ভকার প্রভৃতি]	[ছুতার, স্বর্ণকার, আভীর, তৈলিক কৈবর্ত, রজক, শুঁড়ি প্রভৃতি]	[ব্যাধ, হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর, চামার, চণ্ডাল প্রভৃতি]

৩। বর্ণ বিভাজন [৩য় যুগ]

১। ব্রাহ্মণ	২। বৈদ্য ও কায়স্থ	৩। নবশাখ সম্প্রদায় [উত্তম সংকর] [গোপ, মালি, তাম্বুলী, শঙ্খকার, কর্মকার, তন্তুবায়, নাপিত প্রভৃতি]

৪। বর্ণ বিভাজন [৪র্থ যুগ উনিশ শতক]

১। ব্রাহ্মণ	২। কায়স্থ ও বৈদ্য	৩। নব শাখসম্প্রদায় [মধ্যভাগ]

ক। গোপ, মালি, তাম্বুলি, শঙ্খকার, কাংস্যকার, তাঁতি, নাপিত, তিলি, বারুজীবী; গন্ধবণিক ও মোদক	খ। কৈবর্ত, মাহিষ্য, উগ্রক্ষত্রিয় সুবর্ণবণিক, সাহা, শুঁড়ি, তেলি, কলু ও ধোপা	গ। যুগী, চাঁড়াল, নমঃ-শূদ্র, চামার, মুচি, হাড়ি ডোম বাগ্দী প্রভৃতি [এঁরা সকলেই অস্পৃশ্য ছিলেন]

উপরোক্ত সারণিগুলি থেকে সহজেই বোঝা যেতে পারে যে এদেশে বর্ণ ব্যবস্থা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি। এমন বিবর্তন বিভিন্ন সময়েই ঘটেছে। এবং তা সবচেয়ে বেশি ঘটছে উনবিংশ শতাব্দীতে। কেন না এই শতাব্দীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই বর্ণভেদ প্রথার ক্ষেত্রে শিথিলতা এনে দেয়। কলকাতা শহরের বৃদ্ধি ও গ্রামীণ আর্থ-সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙনই এর একমাত্র কারণ। যথার্থই কলকাতা শহর যতই বৃদ্ধি পেয়েছে ততই এদেশের কৃষি নির্ভর সমাজেও পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। এর ফলে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থাও ভাঙতে শুরু করে। এই ভাঙনের পথ ধরেই, কলকাতা শহরে বহু লোকের আনাগোনা আরম্ভ হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যও কলকাতা নগরীকে আশ্রয় করেই বেড়ে উঠতে থাকে। আর যেহেতু এখানে বর্ণভেদের কোন বলাই ছিল না; তাই নিম্নবর্ণের অনেকেই আর্থিক অবস্থা ফেরাতে কলকাতাকেই বেছে নিয়েছে। এরই সঙ্গে উনিশ শতকের প্রথম দিকে ধর্মতলা অ্যাকাডেমির মতো কয়েকটি স্কুলে এবং দেশীয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হিন্দু কলেজে শিক্ষিত দেশীয় যুবকরা নতুন চিন্তা ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন। এতে দেশে এক নতুন ধরণের সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হয়, ফলে নতুন ও পুরাতন আদর্শের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু বিদেশী শাসকেরা এ বিষয়ে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা একদিকে যেমন এ দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি, অপরদিকে তেমনি একে সমর্থনও করেননি। ফলে কলকাতার দেশীয় সমাজের বাঁধন শিথিল হতে কোন বাধাই পায় নি।

ফলে, কোলকাতাকে আশ্রয় করে বর্ণ-বিন্যাসে ভাঙনের অবকাশে সৎ-শূদ্র পর্যায়ের লোকেরা সামাজিক মর্যাদালাভের জন্যে যেমন সচেষ্ট থেকেছেন তেমনি অন্য শ্রেণীও অর্থকৌলীন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠলে, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির দাবিতে, আবেদন-নিবেদন নয়, গণ-আন্দোলনের পথকেই বেছে নিয়েছেন। অনেকেই বর্ণ গোত্র অর্থাৎ আত্ম-পরিচয় ছিন্ন করে নতুনভাবে সমাজে পরিচিত হতে চাইলেন। যেমন মৎসজীবী কৈবর্তরা অধিকতর সামাজিক মর্যাদার দাবি করে নিজেদের মাহিষ্য বলে পরিচয় দিতে শুরু করেন।[১৬] এ ভাবে গোপ ও তেলি সমাজও অপরাপর 'নবশাখ' সম্প্রদায়ের সমান সামাজিক মর্যাদার দাবীতে আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই সব বর্ণগোষ্ঠীকৃত সামাজিক আন্দোলনের ফলে অপরাপর বহু বর্ণের মানুষ জলচল 'নবশাখ' সম্প্রদায়ে উন্নীত হতে পেরেছিল। কিন্তু এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, যারা অর্ধসংকর হিসাবে সমাজে চিহ্নিত ছিল তাদের দাবী তেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলো না।

এ দেশের অন্যান্য বর্ণের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেই শূদ্র-জাগরণ সূচিত হয়েছিল। সেই শূদ্র জাগরণ পূর্ববঙ্গের [অধুনা বাঙলাদেশের] নমঃশূদ্র জাতির ভেতরই প্রথম দেখা যায়। তাঁরাই প্রথম সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উঠে পড়ে লাগেন। তাঁদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়ায়ের আগে, প্রাচীন এবং সমকালীন সমাজে তাঁদের কি পরিচয় বা ভূমিকা ছিল এ-প্রসঙ্গে, সে সম্বন্ধে কিছু জানার প্রয়োজন মনে করি।

নমঃশূদ্র জাতির বর্ণ-পরিচয় মেলে শূদ্র পিতা এবং ব্রাহ্মণ মাতার ঔরস-জাত সন্তান হিসাবে। নমঃশূদ্রের বসবাস গোটা বাঙলা দেশ জুড়ে না হলেও, পূর্ববঙ্গে এঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বর্ণগত বৃত্তিতে দেখা যায় এঁরা মূলত: 'Engaged for the most part in boating and cultivation. Bengali Namasudras are for the most part peaceful, hard working, cheerful cultivators'. নমঃশূদ্র জাতির সম্পর্কে আরো পরিচয় জানা যায়: "রাজা বল্লালসেন পিতার রোগ মুক্তির জন্য কান্যকুব্জ হতে ৫ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ আনান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য। তাঁদের সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থ এসেছিলেন- এবং তাঁদের বংশধরেরা বাংলার ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমাজে কুলীন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রথমে কান্যকুব্জরাজ ব্রাহ্মণ পাঠাতে অরাজী হলে বল্লালসেন ৫০০ অনার্যকে গরুর পিঠে চড়িয়ে যুদ্ধে পাঠান। গোহত্যার

ভয়ে কান্যকুব্জরাজ যুদ্ধ না করে ব্রাহ্মণদের পাঠিয়ে দেন। বল্লালসেন প্রতিদানে এই ৫০০ জন অনার্যকে হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ব্রাহ্মণদের এক সম্প্রদায় রাজরোষে পতিত হন। প্রাণভয়ে এই ব্রাহ্মণেরা নদী বহুল পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। পরিচয় গোপনের জন্য তাঁরা পৈতা ছিঁড়ে ফেলেন ও জীবিকার জন্য মৎস্যশিকার ও কৃষিকার্যে লিপ্ত হন। শূদ্রের পেশা গ্রহণ করলেও নিজেদের শূদ্রের নমস্য 'নমঃশূদ্র' নামে পরিচয় দেন। ..... শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদায় বঞ্চিত হয়ে, দারিদ্র্য ও হীনতর জীবনযাত্রার জন্য তাঁরা অবশেষে 'জল অচল' সমাজে পরিণত হন।"[১৮] সেই থেকেই হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থায় নমঃশূদ্রজাতি অস্পৃশ্য জাতি হিসাবেই গণ্য হয়ে এসেছে। শূদ্র হিসাবে সামাজিক মর্যাদা কোনদিনই পেতে পারেনি। অবহেলা, অবজ্ঞা, ও বঞ্চনাতেই তাঁদের কাল কেটেছে। কারণ, বর্ণহিন্দু সমাজের কাছে Like a sudra ·...the servant of another, to be removed at will, to be slain at will.[১৯] কিন্তু এই সামাজিক শোষণকে, বিশেষ করে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়— উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই অস্বীকার করেন। তাঁরা এই শোষণ থেকে মুক্তি ঘোষণা করতে চাইলেন। ফলে, সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠলো। ব্যাপক অঞ্চলে গোটা নমঃ-শূদ্র সমাজেই এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গের বরিশাল, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও পদ্মা-মধুমতীর তীরের নমঃশূদ্রেরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ।[২০] তাঁদের মূলতঃ জীবিকা ছিল কৃষিকার্য। তথাপি উচ্চবর্ণের লোকে এঁদের দ্বারা যত রকম কায়িক পরিশ্রম করিয়ে নিয়েছে। উচ্চ বর্ণের এই বিদ্বেষ ও নীচুতাকে সহ্য করতে পারেনি নমঃশূদ্র সমাজ। তাঁরা ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তাঁরা সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর হন। জাত বিচারের প্রশ্নে নমঃশূদ্র জাতি অন্যান্য 'নবশাখ' সম্প্রদায়ের মত অধিকতর সামাজিক মর্যাদার দাবি করেন। মনু সংহিতার অনুশাসন নমঃশূদ্ররা মানতে বাধ্য হলেন না। ফলে উচ্চবর্ণের লোকেরা নমঃশূদ্র জাতির প্রতি দুর্ব্যবহার আরম্ভ করেন। বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের কায়স্থরা অহেতুক নমঃশূদ্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে যেতে চাইলে নমঃশূদ্র জাতি আত্মমর্যাদার লড়ায়ে নামতে হতে বাধ্য হন। এতে ১৮৭৩ সালে স্ব-জাতির সম্মান ও আত্মরক্ষার্থে এবং কায়স্থদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলে এক গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়। এই

গণ-আন্দোলনের কার্যক্রম কেবল সভা-সমিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে জনগণকে এই আন্দোলনের সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করেন তদানীন্তন নমঃশূদ্র সমাজের অগ্রণী অংশ। ১৮৭৩ সালে গোটা ফরিদপুর জেলায় একটি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।[৩৮]

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতিভেদ বিষয়ে এই ধরণের ধর্মঘট পালনের ডাক ধর্মঘটের ইতিহাসে প্রথম এবং অভিনবও বটে। জাত বিচারের প্রশ্নে বা বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে নমঃশূদ্র জাতিরা ধর্মঘট পালনের ক্ষেত্রে কতকগুলো দাবি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন। তাঁদের প্রথম ও প্রধান দাবি ছিল তাঁরা অন্য কোন জাতির বা লোকের সেবা করবেন না। দ্বিতীয় দাবি ছিল—ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের পাকান্ন গ্রহণ করবেন না। মূলতঃ এই দুটি দাবিকে কেন্দ্র করেই একটা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া সেকালের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নয়। ভাবলে অবাক হতে হয়—সামাজিক আত্মসম্মানের প্রশ্নে তাঁরা সমস্ত রকম কাজ কর্ম প্রায় বন্ধ করেও দিয়েছিলেন। কিছু সংখ্যক নমঃশূদ্র তো জাতিগত বৃত্তি বর্জন করে, নৌকার মাঝি-মাল্লা হিসাবে জীবিকার্জনের চেষ্টা করেছেন।

ঐ ধর্মঘট বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। এবং তাঁদের এই ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত সফলও হয়নি। এমন কি তাঁদের বর্ণ বা জাতিগত মর্যাদাও কোন ভাবে বৃদ্ধি পায়নি।[৩৯] কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের কাছে এঁদের এই আন্দোলনের আবেদন একেবারে নিষ্ফল হয়নি। এ-তাদের কাছে এক নতুন অর্থ ও শিক্ষা বহন করে এনেছিল। এই শোষিত, নির্যাতিত মানুষের ঐক্যই ছিল এই ধর্মঘটের প্রেরণা ও প্রাণ শক্তি। এবং সমাজে বর্ণ-ব্যবস্থার উৎখাত, সমান অধিকারের প্রশ্নটিও এখানে ছিল মুখ্য। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে নমঃশূদ্র জাতির এই সামাজিক প্রতিষ্ঠা-কামনার ভিতর দিয়ে এক শোষণ মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৌঁছতেও চেয়েছিলেন। সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা বড় কথা নয়, শূদ্র জাতির নবজাগরণের প্রাক্-প্রস্তুতি হিসাবে এই ধর্মঘট অন্যান্য শোষিত শ্রমজীবী মানুষকে মানবতাবাদে উজ্জীবিত করতে এক সফল ভূমিকা নিয়েছিল। এখানেই এই আন্দোলনের মূল মর্মবস্তু ও সার্থকতার পরিচয়।

খ. ছাত্র ধর্মঘট ঃ

ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিস্তারের দিকে ইংরেজ শাসকের তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। এ-দেশীয়দের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কোন আগ্রহই দেখা যায় নি। ইংরেজ শাসকেরা ভাবতো, এ দেশীয় লোকেরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠলে, তাঁদের শাসন ব্যবস্থা যে কোন সময় অচল হয়ে যেতে পারে, এই আশংকায় তাঁরা কোন রকম শিক্ষার জন্য ব্যয় করাকে পছন্দ করতেন না। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও .... এই বিশ্বাস ছিল যে, জনসাধারণ শিক্ষা লাভ করে উঠলে রাজদ্রোহী হয়ে উঠবে।'[৪০] তাঁদের এ চিন্তা অমূলক ছিল না। তবে এ দেশের মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান কোন অংশে কম নয়। তাঁরা এদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেন তার ফল হাতে-নাতে ফলে। বাঙলার একদল যুবক যাঁরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে ধর্ম ও সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। নবলব্ধ ইংরাজী শিক্ষার ফল আর যাই হোক না কেন। উচ্চ-শিক্ষার জন্যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশে যেমন শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়, তেমনি হিন্দু কলেজের শিক্ষা-দীক্ষায় এ দেশের ছাত্রগণ দেশপ্রেমে যে উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই দেশপ্রেম বা স্বাদেশীকতাবোধের প্রেরণা হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর কাছ থেকে বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। জাতিতে ডিরোজিও ফিরিঙ্গি হলেও, মনে প্রাণে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি ভারতীয়। তিনি তাই ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনায় নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। এবং সেইসঙ্গে নিজের প্রিয় ছাত্রদের বিপ্লবী প্রেরণাদান করেছিলেন স্বদেশের হিতার্থেই। 'Young Lions of Bengal' কেবল সামাজিক কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে নয়, বিদেশীর দাসত্বের বিরুদ্ধেও ঘন ঘন গর্জন করে উঠতেন।[৪১] ডিরোজিওর এই তর্জন-গর্জন বিফলে যায়নি। তাঁর ব্যক্তিত্বের অমোঘ প্রভাব কেবলমাত্র ছাত্র সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 'বাংলার দীপ্ত তারুণ্যের কাছে তাঁর আবেদন গভীর। এই আবেদনে তরুণদের মনে সাড়া জাগছিল এবং হিন্দু সমাজও আতংকিত হয়ে উঠছিল।'[৪২] হিন্দু কলেজের শিক্ষিত ছাত্ররা কেবল প্রগতিশীলতার আদর্শেই বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁরা রীতি মতো রাষ্ট্রনীতিতেও অংশ গ্রহণে পিছুপা হননি। হিন্দু-কলেজ শুধুমাত্র শিক্ষা চর্চারই পীঠস্থান হয়ে থাকেনি, এখান থেকেই ভারতীয় রাজনীতি

চর্চার গোড়া পত্তনের ইতিহাস বলা যেতে পারে। ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতিক চিন্তাধারার প্রতিফলনে দেখা যায় ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজের একদল ছাত্র সর্ব প্রথম এগিয়ে আসেন একটি আধা রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের জন্ম দিতে। এই ছাত্র সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্যই ছিল ভারতীয় ছাত্রদের মনে ব্রিটিশ বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলা। ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠন গড়ে তুলতে হলে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, সেকালের ছাত্ররা এ-কথা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই সুপ্ত চিন্তা-ভাবনাকে রূপায়িত করতেই ১৮৪১ সাল নাগাদ কলকাতায় একটি ছাত্র সংগঠনের জন্ম অনিবার্য-হয়ে ওঠে, যা—'দেশহিতৈষী' নামে এ দেশের শিক্ষার যথার্থ পরিবেশ গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা পর্বের প্রাক্কালে অর্থাৎ 'দেশহিতৈষী' ছাত্র সংগঠনটির পক্ষ থেকে, এই সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, 'এ দেশে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হলে জনগণের যাবতীয় রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে……এই কারণে আমাদের দুঃখ কষ্ট দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এই স্বাধীনতা হরণই আমাদের সমস্ত দুর্গতির ও অধঃপতনের কারণ।'[৪৩] এই সংগঠনের অন্যতম সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ডিরোজিওর ছাত্র সারদাপ্রসাদ ঘোষ ভারতের জাতীয় ঐক্য গঠনে ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। ১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'দেশহিতৈষী' সংস্থা ধর্মীয় ও সামাজিক চেতনার চেয়ে রাজনৈতিক চেতনা ও অধিকার অর্জনের দিকে বেশী মাত্রায় নজর দেয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনার অঙ্কুর এখান থেকেই যে প্রকাশ্যে পল্লবিত হতে থাকে, সে-বিষয়ে কোন সংশয় নেই। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে যে রাজনৈতিক চেতনার অঙ্কুর মহীরুহে পরিণত হতে পেরেছিল তা মূলতঃ 'দেশহিতৈষী' ছাত্র সংগঠনটির রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা-ভাবনার প্রেক্ষিতেই।

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ এদেশের মানুষের চেতনায় যে জ্বালা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল, সেই জ্বালাবোধ থেকেই ভারতবাসী বিদেশী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তিলাভ করতে চেয়েছিলেন। এই মুক্তিলাভের প্রেরণাতেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু ছোট ও বড় প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে। এই সময়েই কলকাতায় ছাত্ররা রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা শুরু করে। সেই সঙ্গে তাঁরা এদেশে একটি শক্তিশালী গণসংগঠনের কথাও

ভেবেছিলেন। ১৮৭০ সাল থেকে ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক সভা-সংগঠনের বিষয়টিও দানা বাঁধতে থাকে। ১৮৭৫ সালে ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল ছাত্ররাও এ বিষয়ে অধিক আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন। ব্রাহ্ম সমাজের ভিতরে ছাত্র সমাজের উদ্ভব বলা যেতে পারে কেবল রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার বিস্তার ঘটাতেই। ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁরাই ব্রাহ্ম সমাজের ভিতরে ছাত্র সংগঠনের কথা যেমন চিন্তা করেন, তেমনি এ বিষয়ে তাঁরা কর্মদক্ষতারও পরিচয় রাখেন। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ ছাত্ররা, ছাত্রদের নিজস্ব সংগঠন তৈরি করার প্রস্তাব রাখেন জাতীয়তাবাদী নেতা আনন্দমোহন বসুর নিকটে। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই ছাত্ররা নিজেদের সংগঠনটি শক্তিশালী করে গড়ে তোলার দিকে ঝুঁকে পড়েন। আনন্দমোহন বসু ছাত্রদের সঙ্গে ঐক্যমত্যে উপনীত হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ বিষয়ে তাঁর পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৮৭৬ সালে ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত নতুন ছাত্রসংগঠটির নাম দেওয়া হয় 'কলকাতা ছাত্র এ্যাসোসিয়েশন।' উনিশ শতকের সাতের দশকে গঠিত ছাত্র সংগঠনটিই সারা দেশে একটা রাজনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ব্রিটিশ বিরোধী কার্যক্রমে এই ছাত্র সংগঠনটির কার্যকলাপ ছিল অনন্য। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নির্মম অত্যাচারের মুখোশ খুলে দিতে এই সংগঠনের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

'কলকাতা ছাত্র এ্যাসোসিয়েশনের' মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে দেশ-প্রেমের চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে আনন্দবাবু ও সুরেনবাবু উভয়েই বেশ সাড়া জাগাতে পেরেছিলেন। এঁরা ছাত্র সমাজের কাছে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

ছাত্র আন্দোলনের প্রথম যুগে এঁদের সক্রিয় সহযোগিতাই পরবর্তীকালের ছাত্র আন্দোলনগুলিকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করতে সাহয্যে করে। ১৮৭৬ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বেই বাঙলার ছাত্র সমাজ দুর্বার হয়ে ওঠে। বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন ছিল সেকালের ছাত্র সংগঠনের পক্ষে। শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনের মুখ্য প্রেরণাই বাঙলার ছাত্র সমাজকে বিভিন্ন গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায়। ছাত্র সংগঠন ছাড়া ভারতবর্ষে তখন পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলের জন্মই হয়নি। যার দ্বারা এ দেশের জনসাধারণ ব্যাপক অংশকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল করা যায়। তখন একমাত্র ভরসা ছিল

ছাত্র সংগঠনগুলিই। আটের দশকের আগে ভারতীয় জনগণের কাছে কোন রাজনৈতিক ধারণা স্পষ্টই হতে পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ধারণার অভাব সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। সে সময়ে ভারতে কোন রাজনৈতিক পরিস্থিতি গড়ে ওঠেনি বলেই এবং রাজনীতি চর্চার কোন অনুকূল পরিবেশ না থাকার জন্যে, সেকালে একমাত্র ভরসা ছিল ছোট ছোট ছাত্র সংগঠনগুলিই। যার ভিতর দিয়ে তদানীন্তন কালে দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগ্রত হতে দেখা যায়।[৪৪] ছাত্র সংগঠনগুলিই যে কোন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে; যার পরিচয় ভারতের ছাত্র আন্দোলনগুলির ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

মিটিং, মিছিল, সভা সমাবেশ ছাড়াও ছাত্র সংগঠনগুলি ধর্মঘট পালন করার মতো মানসিকতাও গড়ে তুলেছিল। যে কোন অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সেকালের ছাত্ররা প্রতিরোধের ও প্রতিবাদের মাধ্যম হিসাবে ধর্মঘটকেই সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। অবশ্য সেই ধর্মঘট আন্দোলনগুলি ক্লাশ বর্জন বা বয়কটের ভিতরেই নিহিত ছিল।

১৮৩৫ সালের জুন মাসে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। 'কলকাতা মেডিকেল কলেজে একটি হিন্দুস্থানী শ্রেণী খোলা হয় ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে। ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থলে সৈন্যবিভাগের ছাউনি ছিল। ঐসব ছাউনীর হিন্দুস্থানী সিপাহীর চিকিৎসার সুবিধার নিমিত্তই কলেজে এই বিভাগের উদ্ভব'।[৪৫] হিন্দুস্থানী বিভাগছাড়াও, মেডিক্যাল কলেজে ১৮৫২ সনে বাঙলা বিভাগ খোলার ব্যবস্থা হয়। 'বাঙলার অভ্যন্তরে জেলা ও মহকুমা শহরে এবং থানায় ও বর্ধিষ্ণু গ্রামে পর্যন্ত চিকিৎসক নিয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। স্থানে স্থানে হাসপাতাল স্থাপনেরও কথা চলে। কিন্তু চিকিৎসক হইবেন কাহারা? মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংখ্যা সীমিত। প্রতি বৎসর অল্পসংখ্যক ছাত্রই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। প্রধান শহরের চাহিদা মিটাইতেই তাঁহারা ছিলেন নিতান্ত অপ্রচুর।"[৪৬] এইসব কারণেই কলকাতা মেডিক্যোল কলেজের মধ্যে বাঙলা শ্রেণী খোলা হয়েছিল। এই বাঙলা শ্রেণীর ছাত্ররা একদা ধর্মঘট পালন করতে বাধ্য হয়। ছাত্ররা কলেজে ধর্মঘট পালন করে একটিমাত্র কারণেই। সেকালে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ডাঃ ছিবার্স। তিনি বাঙলাশ্রেণীর জনৈক ছাত্রকে চুরির অভিযোগে পুলিশে দিলে ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে ক্লাশ বর্জন করে ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই

ধর্মঘটের তীব্রতা বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছিল। বাঙলা বিভাগের থার্ডইয়ারের কিছু ছাত্র ও ধর্মঘট পালন করে সহপাঠী ছাত্রটির বিনাদোষে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানাতে কুণ্ঠিত হয়নি। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সভা-সমিতিরও আয়োজন করা হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যস্থতায় বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার লেফটেন্যান্ট গর্ভণর এক কমিশন বসিয়ে ঘটনাটির তদন্ত করান। এই তদন্তে ছাত্রটি নির্দোষ প্রমাণিত হলে ছাত্রটি বিনাশর্তে মুক্তি পায় এবং ছাত্ররাও তাঁদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়।

কংগ্রেস সংগঠনের জন্মের তিন বছর আগে ১৮৮২ সালে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তৎকালীন ছাত্রদের ধর্মঘট পালন করার ঐতিহাসিক ঘটনা সহজে বিস্মৃত হওয়ার নয়। এই ধর্মঘটের কারণ আর কিছুই নয়। ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত এই ধর্মঘট মূলতঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মানহানির মামলা ও কারাদণ্ডের জন্যে ঘটে। ঘটনাটির বিবরণ থেকে জানা যায় যে, একটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নরিস সাহেব বিচারের রায় ঘোষণা করার সুবিধার জন্যে হাইকোর্টের হিন্দুদের শালগ্রাম শিলা আনার জন্যে বলেন। কোন বিচারকের পক্ষে এ ধরণের আদেশ যুক্তি সংগত নয়। এই সব আদালতে শালগ্রাম শিলা আনার বিরুদ্ধে ১৮৮৩ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সম্পাদিত 'বেঙ্গলি'তে তীব্র সমালোচনা করে লেখেন যে, মিঃ নরিস দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক হওয়ার অনুপযুক্ত। সুরেন্দ্রনাথকৃত কঠোর সমালোচনার বিরুদ্ধে আদালত অবমানার দায়ে তাঁকে সোপর্দ করা হয়। ডব্লু. সি ব্যানার্জির পরামর্শক্রমে সুরেন্দ্রনাথ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু এতেও তাঁর রেহাই হয়নি। বিচারপতিরা তাঁকে দু-মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেন। বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র বিচারকদের রায়ের বিরুদ্ধে পূর্বদৃষ্টান্ত তুলে ধরে কেবল জরিমানার পক্ষে বলেন। বিচারপতিরা রমেশ মিত্রের মতামত মেনে নিলেন না। এর ফলে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। এবারে ছাত্র সমাজও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা এর প্রতিবাদে বিচারের দিনে একযোগে ধর্মঘট করে হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে গিয়ে উপস্থিত হয়। এ-বিষয়ে যিনি ছাত্রদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি আর কেউ নন, পরবর্তীকালের ভারতখ্যাত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।[৪৭] ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এর দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। 'হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়ান এ্যাসো-

সিয়েশনের' লেখক যোগেশচন্দ্র বাগল ছাত্রদের এই ধর্মঘটের ঘটনাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি যুগান্ত সৃষ্টিকারী ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। সেদিনের ছাত্র ধর্মঘট কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই আন্দোলনের ব্যাপকতার দিকে লক্ষ্য রেখে আনন্দমোহন বসু ১৮৮৩ সালের 'ভারত সভার' কার্য বিবরণীতে এই মর্মে লিখেছেন :

'অশুভ থেকে শুভর উদ্ভব—বাক্যটি যথার্থ্য এ ঘটনায় যেরূপ সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হল এমনটি পূর্বে কখনো হয়নি। এ ব্যাপারটিতে সর্বত্র যতখানি গভীর ক্রোধ ও ক্ষোভের উদ্রেক হয়েছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রদেশের জনগণ পরস্পরের জন্য বেদনা বোধ করতে শিখেছে এবং ঐক্য ও প্রীতিবন্ধন অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।'[৪৮]

উনিশ শতকের বাঙলার ছাত্র-সমাজই সংঘবদ্ধভাবে ইংরেজের শাসনের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, প্রয়োজনবোধে ক্লাশ বর্জন ও ধর্মঘটের মতো কর্মসূচী গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। সেদিনের ছোট বড় ছাত্র ধর্মঘটগুলিই বাঙলাদেশের বিপুল সংখ্যক নর-নারীকে একই মঞ্চে আনতে পেরেছিল। এবং ধর্মঘটগুলিই ছাত্র ও যুব জনতাকে একই রাজনৈতিক চিন্তায় ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল। বলাই বাহুল্য, ছাত্রদের খণ্ড বিচ্ছিন্ন ধর্মঘটগুলির ভিতর দিয়েই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সুপ্ত বীজটি অঙ্কুরিত হতে পেরেছিল।

এঞ ॥ উপসংহার

'ধর্মঘট' শব্দটি প্রাচীন হলেও, উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ভারতের মানুষের কাছে 'ধর্মঘট' ব্যাপারটি ছিল অজ্ঞাত। 'ধর্মঘট' ভারতীয় শ্রমিকদের কাছে 'তাৎক্ষণিক ও অন্তিম লক্ষ্য সাধনের একটা শক্তিশালী সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে বিবেচিত' হয়ে উঠতে পারে নি। হবেই বা কি করে? তখনও পর্যন্ত এদেশের মাটিতে উপার্জক শ্রেণীর [wage earner class] জন্মই হয়নি। সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক সচেতনতাও ছিল দূর অস্ত। শ্রমিক শ্রেণীতো ছিলই না। ছিল শ্রমের বিনিময়ে শোষণের অসহনীয় চিত্র। যে শোষিত মানুষকে দেখেছি ক্রীতদাসের ভূমিকায়। যারা আবার পরবর্তীকালে 'ভূমিদাস' নামে মানুষের সভ্যতার শিকার হয়েছে। আরও ব্যাপক অর্থে 'ভূমিদাসে'র সংজ্ঞা অন্যভাবে বদলে যায় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। 'ক্রীতদাস' থেকে 'ভূমিদাস'।

'ভূমিদাস' থেকে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিকের অন্য নাম, কার্ল মার্কসের ভাষায়, 'মজুরী দাস' [wage slave]।[৪৯] পুঁজিপতির নিকট শ্রম-ক্ষমতা বিক্রি করার বিনিময়ে যে মজুরীতে শ্রমিক শ্রেণী তার সংসার নির্বাহ করতে পারে,সেই শ্রমের বিনিময়ে মজুরী পাওয়ার অর্থেই 'মজুরীদাস' শ্রেণীর উদ্ভব। যদিও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ক্ষমতায় 'মজুরীদাস', 'ক্রীতদাস' কিংবা ভূমিদাস প্রথার মতো এতো নির্মম নয়। 'ক্রীতদাস' কিংবা ভূমিদাস প্রথার একটু শোভন সংস্করণ মাত্র। 'মজুরীদাস'কে শোষণ করা হয় একটু রেখে ঢেকেই। মজুরীদাসের উৎপন্নের বেশীর ভাগটাই চলে যায় পুঁজিপতির পকেটে। মজুরীদাস শুধু নিজেকে কর্মক্ষম অবস্থায় বজায় রাখতে এবং বংশবৃদ্ধির জন্যে যতটা প্রয়োজন ততটুকুই নিয়েই তুষ্ট থাকতে হয়।

আমরা জানি সমাজ দুটি বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত। একদিকে পুঁজিপতিরা এবং সমস্ত উৎপাদনের উপর, ভূমি, কাঁচা মাল, যন্ত্রপাতির একাধিপতিরা, অপরদিকে রয়েছে শ্রমজীবীরা—যারা নিজেদের শ্রমক্ষমতা ছাড়া আর কিছুরই মালিক নয়। শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে পুঁজিপতিশ্রেণীর একটা প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক থেকেই গেছে এবং যায়। পুঁজিপতি ছাড়া শ্রমিক বাঁচে না, শ্রমিক ছাড়া পুঁজিপতিও টেঁকে না।[৫০] কিন্তু ভারতে আর এক শ্রেণীর মানুষ ছিল। যাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর আগেই আবির্ভূত হয়েছিল। যাঁরা কখনও কোন সংগঠিত শ্রমশক্তির অংশীদারও ছিল না। কিংবা কোন ব্যক্তিগত মালিকানায় পুঁজিপতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও ছিলেন না। এ ধরণের শ্রেণীকে শ্রমিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। বড়োজোর শ্রমজীবী শ্রেণীর একটি উপ-শ্রেণী বলা যেতে পারে। যাঁরা ভারতের মাটিতে শিল্প বিকাশের বহু-পূর্বেই জন্ম নিয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে বলাই বাহুল্য ১৮৫০ সালের আগে পর্যন্ত এ দেশে শিল্প ব্যবস্থার কোন সুষ্ঠু উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করা হয়নি।

বৃটিশ শাসনে নানাভাবে এদেশের মানুষ উৎখাত হয়েছেন,—নিজেদের বর্ণে ও বৃত্তি থেকে। জায়গা জমি এবং ভারতীয় কুটির শিল্পগুলিকে অনিবার্য ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে। ফলে, বহু মানুষের পক্ষে তাদের বংশানুক্রমিক পেশা ছেড়ে হঠাৎ কোন বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি। সেরকম কাজের সুযোগ এবং সম্ভাবনাও ছিল না। ইউরোপের ক্ষেত্রে গ্রাম থেকে উৎখাত ছিন্নমূল মানুষেরা নতুন কল-কারখানার মজুরশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে যতবেশী, যত দ্রুত গ্রাম সমাজে ভাঙন ধরেছে, ততই বংশানু-

ক্রমিক বৃত্তিজীবীদের উৎখাত করা হয়েছে এবং ততক্রত তো নয়ই, তার শতাংশের এক গুণ গতিতেও শিল্প-বিকাশের সূচনা হয়নি।[৫১] লক্ষ্য সেখানে ইংলণ্ডকে শিল্পে সমৃদ্ধি করা এবং ভারতকে পণ্যদ্রব্যের বাজারে পরিণত করা, সেখানে ভারতের শিল্প বিকাশের পথ রুদ্ধ হওয়ারই তো কথা। ভারতের ছিন্নমূল মানুষের দল জীবিকার যথার্থ সন্ধান পেলেন না। জীবনে বাঁচার জন্যে একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইলেন। শিল্পের আওতায় বা পুঁজিপতির খপ্পরে না গিয়ে একক এবং স্বাধীনভাবে নির্ভরশীল হওয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলেন। ফলে, নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে যে কোন পেশার কাজকে বেছে নিলেন স্বাধীনভাবেই। এঁরা শ্রমের বিনিময়ে নামমাত্র মজুরী নিয়ে জীবিকা অর্জনের পথ গ্রহণ করেন। সংঘবদ্ধ হওয়া বা কোন শক্রর আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার মতো ও শক্তি ছিল না তাদের। কিংবা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোন গণ-সংগঠনের কথাও ভাবতে পারেনি।

আগেই একবার বলেছি যে ১৮৫০ সালের আগে ভারতে শিল্পের প্রসার তেমনভাবে হয়নি। "শিল্পে শ্রমিক সংগঠনের আগেই তো শিল্পের বাইরে শ্রমজীবীর জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হয়েছে। এই শ্রমজীবী শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকবাদের আঘাত পর্য্যুদস্ত ভারতের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে।"[৫২] বলাই বাহুল্য আমাদের দেশীয় অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ ভেঙে পড়ার মধ্য দিয়েই উর্পাজক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। তাঁরাই তো ভারতের শ্রম আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মঘটের ঐতিহ্য গড়ে দিয়ে গেছেন। সেই ঐতিহ্যবাহী ইতিহাসই যেন আজকের শ্রমিক সমাজেরই পূর্ব ইতিহাস।

ভারতের ধর্মঘটের ইতিহাসে ভারতীয় শ্রমজীবীশ্রেণী [১৮২৭ সালের ১২ই মে] স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোন শিক্ষা বা প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই ; কতকগুলো অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষজনের চেষ্টায় অতর্কিতে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট ঘটায় তা সত্যই বিস্ময়কর। তবে বোধ হয় এই ধর্মঘট থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তদানীন্তন কালের অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণী। কারণ পরবর্তীকালে 'ধর্মঘট'কে আশ্রয় করেই বারে বারে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। শ্রমজীবী সম্প্রদায়, পাল্কি বেয়ারাদের আন্দোলনই অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা গেছে। ভারতে ধর্মঘটের প্রথমযুগে উপার্জক শ্রেণীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায়

যে সমস্ত 'ধর্মঘট' অনুষ্ঠিত হয়েছে, যুগ বিচারের মানদণ্ডে, উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তাঁরা যে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, যে যুগচেতনাকে তাঁরা এ দেশে সঞ্চারিত করেছেন, তাঁদের আন্দোলনের যে গণতান্ত্রিক মূল্য, তাকে নস্যাৎ করা হবে ইতিহাসের প্রতি অবিচার।"[৫৩]

৬.

ভারতের কৃষক ও কৃষিনীতি

ভূমির উপর ভারতীয় কৃষকের দখলিস্বত্ব ও অধিকার ছিল সব যুগেই সমান। কৃষকের জমিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাজা-বাদশাহের ছিল না। কৃষক ও কৃষিক্ষেত্রের উন্নতিতে যাবতীয় সাহায্য ও সহযোগিতার দিকে লক্ষ্য ছিল ভারতীয় শাসকদের। কৃষককে সহায়তা করাই ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধানতম কাজ। দেশকে সমৃদ্ধশালী করতে কৃষিই ছিলো জাতীয় অর্থনীতির মূল কাঠামো। কৃষি-সম্পদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি। সেকালে কৃষিকর্মের দিকেই রাষ্ট্রের মুখ্য প্রেরণা থাকার ফলে কৃষকদেরও মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল আপন আপন জমিতে চাষ-বাস করে শস্য-সম্পদ বৃদ্ধি করা। কৃষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যই ছিল চাষ-বাস করা। কৃষকের চাষবাসের উপরেই নির্ভর করত অর্থনীতির মুখ্য ব্যাপারটি। আর সে জন্যেই কৃষকদের সামনে দুটো লক্ষ্য ছিল ; এক. সময় মত চাষ আবাদ করা ও দুই. সময় মত ধার্য রাজস্ব দিয়ে দেওয়া। এই দুটি দিকে ঠিক রাখতে পারলে সারা বছর নিশ্চিন্তে থাকতে পারতেন এদেশের কৃষিজীবী মানুষ। অপর দিকে নিজের জমিতে কৃষক চাষ করুক বা না করুক, রাজা বাদশাহের সে সব ব্যাপারে লক্ষ্য ছিল না। চাষ করা বা না করা কৃষকদের মন ও মর্জির উপরে নির্ভর করেছে।[২] মধ্যযুগে মুঘল বাদশারা তো বার্ষিক রাজস্ব যথা সময়ে আদায় পেলেই খুশী থেকেছেন। অন্যদিকে তাঁদের তেমন ভ্রূক্ষেপ ছিল না।[৩] তবে অনাবাদি ভূমিকে কর্ষণযোগ্য করে তোলার বিষয়ে কৃষকের সঙ্গে রাজা-বাদশাহেরও সহায়তা কম ছিল না। কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্যে মুঘলদের উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। পতিত জমিকে চাষযোগ্য করার জন্যে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে কার্পণ্য করেননি তাঁরা। ঋণ দেওয়া, ঋণমকুব করা, যন্ত্রপাতি কেনা ; বীজ শস্য ক্রয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে অর্থ অনুদান বা ঋণ কৃষকেরা সহজেই পেয়েছেন। কৃষকদের এই সব নানা ধরণের সুবিধা পাওয়া রাষ্ট্রের কাছে ন্যায়তঃ অধিকারের মতই ছিল। খরা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দুর্ভিক্ষেও কৃষকরা নানাভাবে সাহায্য পেরেছেন।[৪] কৃষকদের জন্যে আর একটি সুযোগ ছিল, নতুন নতুন জনপদ বা এলাকা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে রাজা-বাদশাহের উৎসাহ ছিল প্রবল। এমন দৃষ্টান্ত কেবল ইতিহাসেই নয়—মধ্যযুগের

বাঙ্‌লা সাহিত্যেও মেলে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাচ্ছি কৃষকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বিচিত্র আয়োজন। কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও কৃষিকর্মে উৎসাহিত করার জন্যে কালকেতুর গুজরাট পত্তনের কাহিনীটি উল্লেখিত হয়েছে এইভাবে :

'বীর কর অবধান প্রজাগণ দেহপান
ভূমি বাড়ি করিয়া চিহ্নিত।
কিছু দিবে ধান্য কড়ি বলদ কিনিতে কড়ি
সাধন হইবে বিলম্বিত।'[৫]

কেবল অনুদানই নয়, অর্থঋণ দেওয়ার মত প্রতিশ্রুতিও ছিল কৃষক ও কৃষির স্বার্থে :

'ধার লহ লক্ষ তঙ্কা কারে না করে শঙ্কা
দক্ষিণ আশায় কর বাস।'[৬]

এমন সহজ সুযোগ ছিল কৃষকদের জন্যে। কৃষকরাও এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন অধিক মাত্রায়। কৃষিকে সমৃদ্ধ করতে কৃষকদের উৎসাহিত হওয়ার পিছনে আর একটি মূল প্রেরণা ছিল অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের বিষয়ে। 'গোটা মুঘল আমলে কৃষি কাজের প্রসার হয়েছিল ··তা প্রধানত চাষ-বাসের মাধ্যমেই। এখানে ব্যাপকভাবে মূলধন বিনিয়োগের কথা আসে না, বরং চাষীর দৈহিক শ্রমই প্রধানতম উৎস ছিল।'[৭]

মুসলিম শাসনে বাদশাহ কেবল রাজস্ব আদায়ের মালিক মাত্র ছিলেন, ভূমির মালিক কখনো ছিলেন না। এটাই ছিল মুসলিম শাসনের প্রধান নীতি। মোটামুটি সারা ভারতেই তা প্রচলিত ছিল—রাজারা রাজস্ব নিতেন এবং জমিদারগণ প্রজাদের কাছে থেকে যে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন তা যথাসময়ে রাজাকে রাজস্ব হিসাবে দিতেন। জমির উপর প্রজার পুরুষানুক্রমে অধিকার থাকত এবং সময় মত খাজনা দিয়ে দিতে পারলে জমি কখনও বে-দখল হোত না। মুসলমান আমলে বাদশা জমির মালিক ছিলেন না বলেই, বাদশাকে ব্যাক্তিগত প্রয়োজনে জমিও কিনতে হয়েছে। 'বাদশা কেন জমি কেনেন? তিনি যেহেতু গোটা দেশের মালিক সেই অধিকার বলেই তো তিনি জমি নিয়ে নিতে পারেন।' একদা এ প্রশ্ন করেছিলেন স্যার জন সোর, তাঁর আমলের একজন সুপণ্ডিত গোলাম হোসেন খাঁকে। হোসেন খাঁ স্যার জনের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, 'বাদশার উপর জমির মালিকানা কখনও ন্যস্ত ছিল না। তিনি কেবলমাত্র খিরাজের হকদার। আকবর সাজাহান, ঔরঙ্গজেব, দ্বিতীয় আলমগীর প্রত্যেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত

প্রয়োজনে অথবা দুর্গ তৈরি করার জন্য জমি কিনেছিলেন'।[৮] এ থেকে এটাই প্রমাণ হয়ে যায় যে সেকালে জমির উপর রাজা বা বাদশাহের কোন অধিকার ছিল না। প্রকৃত পক্ষে জমি কৃষকদেরই সম্পত্তি হিসাব গণ্য হয়েছিল।

শের শা মুঘলযুগের একমাত্রই বাদশা, যিনি এদেশের ভূমি-ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে এ কাজ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে এ-কাজটি সফল করার জন্যে আকবর টোডর মলের সাহায্য নিয়েছিলেন। তিনি এ প্রচেষ্টায় সফলও হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করার জন্য কতকগুলি নীতি নির্ধারিত করেছিলেন। যা পরবর্তীকালে কার্ল মার্কস তাঁর ভারত সম্পর্কিত নোটেও উল্লেখ করেন।

সম্রাট আকবর রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যে কটি নীতি রূপায়ণ করেছিলেন তাতে দেখা যায়:

এক। মাপের জন্য সর্বত্র একটি নির্দিষ্ট মানের মাপদণ্ডের [নলের] প্রচলন করা হয়। তারপর নিয়মিত জরীপের ব্যবস্থা করা হয়।

দুই। প্রত্যেক পৃথক পৃথক বিঘার উৎপন্ন ফসল ঠিক করার জন্য এবং সরকারকে কি পরিমাণ রাজস্ব দিতে হবে তা নির্ধারণ করার জন্য, জমির উর্বরতার তারতম্য অনুযায়ী জমিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তারপর প্রত্যেক শ্রেণীর জমির গড় পড়তা ফলন বার করা হয়। এই গড় পড়তা ফলনের একের তৃতীয়াংশ বাদ্‌শার প্রাপ্য অংশ হিসাবে নির্ধারিত হয়।

তিন। এই পরিমাণ ফসলের মূল্য টাকার অঙ্কে কী দাঁড়াবে তো ঠিক করার জন্য ১৯ বছরে সারা দেশে কী দর ছিল তার হিসেব নিয়ে, তার গড় বের করে টাকার অঙ্ক ঠিক করা হয়।

ছোট ছোট রাজ-কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করা হয়। মোট রাজস্ব কম করা হয়। কিন্তু আদায় করার খরচও কমে যায়। ফলে রাজ-সরকারের আয় ঠিকই থাকে। রাজস্ব আদায় করার জন্যে ইজারা দেওয়া প্রথা আকবর রদ করে দেন। এই প্রথা, জবরদস্তিমূলক আদায় ও অনেক প্রকার নিষ্ঠুরতার উৎস ছিল।'[৯] এই নিষ্ঠুরতা ও জবরদস্তিমূলক রাজস্ব আদায় আকবরের আমলে হ্রাস পেলেও, ঔরঙ্গজেবের শাসনে তা যেন উর্দ্ধমুখী হয়ে

ওঠে। বিশেষ করে ১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেব মারা গেলে রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীরা যেন সার্বভৌমত্বের অধিকারী হয়ে ওঠেন। সাধারণ কর্মচারী থেকে তাঁরা রাতারাতি জমিদার হয়ে উঠতে চাইলেন। শুধু জমিদারই নয়, কেউ আবার 'ভূস্বামী রাজা' হয়ে ওঠার জন্যে চাপসৃষ্টি করতেও শুরু করেন। যখন না পেয়েছে, তখন তাঁরা রাজস্ব আদায়কে বংশানুক্রমিক করে নেওয়ার সুযোগ খুঁজেছে। এ সুযোগ নিতেও তাঁদের তেমন কোন অসুবিধা ঘটেনি। কারণ বাদশাহকে কিছু নজরানা দিতে পারলেই আবার ছেলে পুলেদের জন্যেও রাজস্ব আদায়ের পদটির অনুমতি মিলতো।[১০] বলাই বাহুল্য এইসব সুযোগের ফলে কৃষকের শোষণের বাস্তব চিত্রটি দিনের পর দিন অন্য দিকে মোড় নিতে থাকে। সে জন্যেই সেকালের জমিদার শ্রেণীর লোকজনেরা অবাধে কৃষক শোষণের মধ্য দিয়েই প্রচুর অর্থসম্পদ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

ভারতে বৃটিশ শাসনে জমিদার শ্রেণীর দৌরাত্ম্য যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিলেন, তেমনি রাজস্ব আদায়ের দিকে বেশী মাত্রায় ঝোঁক প্রকাশ করায় এ-দেশের কৃষকের শোষণ নানা ভাবেই বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল।

বৃটিশ প্রশাসন এদেশে রাজস্ব আদায়কেই বড় করে দেখার ফলে কৃষির সামগ্রিক উন্নতি অপেক্ষা কৃষককে শোষণ করার জন্যেই মূলতঃ জমিদারদের স্বার্থেই তারা কিছু আইন কার্যকরী করেছিলেন। জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার অর্থ রাজস্ব বৃদ্ধির পরোক্ষ উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা। তা না হলে, নবাবী আমলের থেকে ইংরেজ আমলে কেনই বা সাড়ে চারগুণ বেশী রাজস্ব আদায় হবে।[১১] রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে বৃটিশ প্রশাসন কতগুলো অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। কৃষকের থেকে যত বেশী রাজস্ব সংগ্রহ করা যায় সে উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা দিনের পর দিন নানা রকম নিয়ম-নীতির বন্দোবস্ত করার সুযোগ খুঁজেছেন। তাঁদের মূল লক্ষ্যই ছিল যেন-তেন প্রকারেণ অধিক পরিমাণে রাজস্ব-আদায় করা। কেবলমাত্র রাজস্ব আদায় করাই নয়, আদায়ের নিশ্চয়তা পেতে তাঁরা আরো নয়ানীতির প্রবর্তন করেন। জমিদার হতে গেলে কোন যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল না। যে ব্যক্তি ছলে-বলে কৌশলে বেশী পরিমাণে রাজস্ব আদায় করে দিতে পারতেন তিনি হতেন জমিদার। সে জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের ডাকাত ও দস্যু বলতে দ্বিধা করেননি।[১২] ইংরেজদের নয়ানীতির প্রতি আস্থা রেখেই অনেকেই রাজস্ব আদায় করার

গ্যারান্টি দিয়েছেন। ইংরেজরা নির্দিষ্ট চুক্তিবদ্ধ বার্ষিকীর ভিত্তিতে জমিদারী দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পাঁচশালা, দশশালা প্রভৃতি বার্ষিকীর ভিত্তিতে বন্দোবস্তের ফলে প্রাচীন রাজন্যবর্গের দ্বারা নির্বাচিত জমিদার শ্রেণীর লোপ অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রাচীন জমিদার বংশ লোপের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের আশ্রয় পুষ্ট বিত্তবান ব্যক্তিরা জমিদারী শিরোপা লাভ করে; তারা কৃষক শোষণের অভিনব কৌশলটি আশ্রয় করে বেড়ে উঠতে থাকে। কৃষক শোষণই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। কৃষকের আর্থিক উন্নতি কিংবা কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারণের দিকে তেমন কোন ঝোঁক ছিল না, যতটা রাজস্ব আদায়ের দিকে ছিল। তবে এ নিয়মে জমিদারী স্বত্ব যে কোন সময়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী ছিল।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস বৃটিশ অর্থনীতিকে পাক করে তুলতে, এদেশের জমিদারদের সঙ্গে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র মধ্য দিয়ে স্থায়ী রাজস্ব সংগ্রহের সুযোগটি গ্রহণ করেন। 'ইংল্যাণ্ডের মতো ভূসম্পত্তি ও ভূস্বামী-শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। এবং তিনি আরো মনে করতেন 'আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ভূস্বামীগণকে আমাদের সহযোগী করে নিতে হবে। যে ভূস্বামী একটি লাভজনক ভূ-সম্পত্তি নিশ্চিন্ত মনে ও সুখে শান্তিতে ভোগ করতে পারে, তার মনে উহার কোন রূপ পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগতেই পারে না।'[১৩] ভূসম্পত্তি যে লাভজনক সম্পদ এ কথার সারমর্ম বুঝতে বেনিয়া ইংরেজের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার তাঁর জমিকে নিজের বলেই মনে করতেন। প্রাচীন কালে যা ছিল কৃষকের অধিকারে তা এখন জমিদারের আয়ত্তে চলে যায়। ফলে জমিদার তাঁর জমিতে যা ইচ্ছে তাই করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সময়মত রাজস্ব তুলে দিতে পারলে জমিদারী স্বত্ব নিলামে চলে যাওয়ার কোন ভয় ছিল না। কিন্তু পুরানো দিনের জমিদারেরা ইংরেজদের এই নীতি মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। "পুরাতন বনেদী জমিদারেরা অনেক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার জটিল ও কঠোর নিয়মকানুন ধাতস্থ করতে না পেরে চিরকালের মতো ভূ-স্বামিত্বের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। বছরের পর বছর নূতন রাজস্ব আইন ও নিলাম আইনের চাপে বড় বড় পুরাতন জমিদারী খণ্ড খণ্ড হয়ে 'লাটে' উঠেছে এবং বনেদী ভূস্বামী নিজেদের পৈত্রিক ভদ্রাসন থেকে পর্যন্ত উৎখাত হয়েছেন।"[১৪] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়া জমিদার শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা

করেছে মাত্র। এর ফলে পুরানো জমিদারদের বিদায় যেমন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তেমনি ভুঁইফোঁড় জমিদাররা জমির সর্বময় কর্তৃত্ব পেয়ে কৃষক উৎপীড়নের অপকৌশল খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁরা ইচ্ছা করলেই কৃষকের জমির খাজনা বৃদ্ধি করতেও পারতেন, আবার প্রয়োজন বোধে জমির স্বত্ব কেড়ে নিতে পারতেন। ফলে কৃষকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে জমিদারদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে।

নির্দিষ্ট রাজস্ব দিলে যখন জমিদারী উচ্ছেদের কোন ভয় নেই, সেখানে জমির এবং জমির সঙ্গে যুক্ত কৃষক প্রজার বৈষয়িক উন্নতিতে জমিদারের কোন দায়ভাগ নেই। জমিদারেরা এই সূত্রটুকু মনে রেখেই, বেশী ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে বড় বড় জমিদাররা নিজেদের ইচ্ছামতো অনুগত লোকজনদের জমিদারী উপস্বত্ব দখল দিয়ে একটি মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণীর জমিদার গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটান। যাঁরা পত্তনিদার, দর পত্তনিদার, গাঁতিদার প্রভৃতি শ্রেণী নামে জমিদারীর রক্ষণা-বেক্ষণার কৃতিত্ব অর্জন করেন।[১৫] এইসব ক্ষুদে জমিদার শ্রেণী 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' এই প্রবাদ সর্বস্ব করে নির্বিচারে কৃষক শোষণের নীতিকেই লালন-পালন করেছেন। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে জমিদারদের ক্ষেত্রে যেমন কড়াকড়ি ব্যবস্থা ছিল, কৃষকদের ক্ষেত্রে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে তেমন কোন ব্যবস্থা জমিদারদের ছিল না। এর ফলে জমিদারদের খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় অসুবিধার মুখেও পড়তে হয়েছে। জমিদাররা তাই নিজেদের হাতে কিছু ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি প্রথম থেকেই লর্ডদের কাছে জানিয়ে এসেছিল। অবশেষে ১৭৯৯ সালের সপ্তম রেগুলেশনে তাঁদের হাতে অধিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়ে থাকে। এই আইনের বলে জমিদার প্রজার ফসল, গরু-বাছুর, স্থাবর-অস্থাবর ক্রোক করার সুযোগ পায়। সেই সঙ্গে প্রজাদের কয়েদ করারও ক্ষমতা অধিকার করে।[১৬] এর ফল হয় বিষময়। কৃষকের প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে পড়ে। জমিদাররা কৃষকের উপর শুরু করলো অমানবিক নির্যাতন। এই নির্যাতন চরমে ওঠার ফলে কৃষকেরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। জমিদারদের এই অত্যাচার রদ করার জন্যে ১৮১৩ সালের পঞ্চম রেগুলেশনের মাধ্যমে জমিদারদের হাত থেকে কয়েদ করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। এ কিন্তু সম্পত্তি ক্রোক করার মূল ক্ষমতাটি থেকে যায়। বলাই বাহুল্য মুঘল যুগেও কৃষকের সম্পত্তি ক্রোক্‌ করার

অধিকার বাদশাদের ছিল না। ভারতে বৃটিশ প্রশাসনই এ ধরণের নীতি রূপায়ণের রূপকার। বৃটিশ প্রশাসনে জমিদারেরাই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের হর্তা-কর্তা বিধাতা। এহেন জমিদারদের জোর জুলুমের ইতিহাস কতখানি নিষ্ঠুর ছিল তা যেমন ইতিহাসে মেলে, তেমনি সেকালের পুরানো গ্রন্থ ও সংবাদ পত্রের জরাজীর্ণ পৃষ্ঠাতেও খুঁজে পাওয়া যায়। কৃষক শোষণ কি খাজনা আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? খাজনা আদায় ছাড়াও জমিদারের ইচ্ছা মত 'রাজস্ব, মাঙ্গল, বাটা, বাটার বৃদ্ধি, আগমনী, পার্বণী, হিসেবানা প্রভৃতি আদায়ের মাধ্যমে সাধারণ ভূস্বামীকে দেয় করের চতুর্থাংশের বেশী তাঁরা প্রজাদের কাছে আদায় করেন।'[১৭] এই কর আদায়ের জন্য জমিদারেরা কঠোর ব্যবস্থাও রেখেছিলেন। কেবলমাত্র কয়েদ বা জরিমানাই ছিল না কর আদায়ের কৌশল, কর আদায়ের জন্যে দৈহিক নির্যাতনেরও কঠোর ব্যবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। সেকালের সংবাদপত্রে এ ধরণের দৈহিক শাস্তির নমুনায় দেখা যায় যে, সে সব শাস্তি কত নির্মম ও কঠোর ছিল। আজকের দিনে ভাবা যায় সে সব শাস্তির কথা? এরকম শাস্তি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার পাতা থেকে দাখিল করা যেতে পারে:

১. দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত। ২. চর্মপাদুকা প্রহার। ৩. বংশ কাষ্ঠাদি দ্বারা বক্ষঃস্থল দলন।· ৪. থাপরা দিয়া কর্ণ ও নাসিকা মর্দন। ৫. ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ। ৬. পিঠে দুই হাত মোড়া দিয়ে বেঁধে বংশ-দণ্ড দিয়ে মোড়া দেওয়া। ৭. গায়ে বিছুটি দেওয়া। ৮. হাত পা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা। ৯. কানধরে দৌড় করানো। ১০. কাঁটা দিয়ে হস্ত-দলন। দুখানি বাঁখারি দিয়ে হাত পা দলন করা। ১১. গ্রীষ্মকালে ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে পা ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে, পিঠ বেঁকিয়ে পিঠের ও হাতের উপর ইট চাপিয়ে রাখা। ১২. প্রচণ্ড শীতে জলমগ্ন করা বা গায়ে জল নিক্ষেপ করা। ১৩. 'গোনীবদ্ধ' করে জলমগ্ন করা। ১৪. বৃক্ষে বা অন্যত্র বেঁধে লম্বা করা। ১৫. ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় পুরে রাখা। ১৬. চুণের ঘরে বন্ধ করে রাখা। ১৭. কারারুদ্ধ করে উপোষ রাখা। ১৮. গৃহবন্দী করে লংকা মরীচের ধোঁওয়া দেওয়া।[১৮]

এই আঠারো রকম পাশবিক অত্যাচার তো হামেশাই ছিল। এই সব শোষণের মাত্রা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল তার সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর জুলুমেরও অন্ত ছিল না। জমিদারদের অত্যাচারের সঙ্গে ইংরেজদের যৌথ অত্যাচাব মুখ বুজে সহ্য করতে পারেনি এদেশের কৃষক সমাজ। কৃষকরাও তাই শক্ত হাতে অত্যাচারের মোকাবিলায় মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কৃষকদের মতো সেকালে অন্য কোন শ্রেণী এত নির্যাতন সহ্য করে নি। অপরদিকে ভাবতের কৃষিজীবী সমাজও ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন অত্যাচারী ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভূমিনীতির ফলেই ভারতীয় অর্থনীতি এক নিদারুণ সংকটের মুখে গিয়ে পড়ে। বিশেষ করে কৃষকদের অপরিসীম দুর্গতির চিত্রটি ধরা পড়ে দুটি বিশেষ কারণে; এক. ঔপনিবেশিক ও দুই. সামন্ততান্ত্রিক উৎপীড়নের জন্যে। ভূমিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর অত্যাচারই ঔপনিবেশিক শাসনেব প্রতি কৃষকের একটা বীতশ্রদ্ধ মনোভাব তৈরি করে দেয়। ফলে, এদেশে সাম্রাজ্য বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠার অনেক আগেই 'ভারতের কৃষক ও আদিবাসীরা ঔপনিবেশিক ও সামন্ত-শোষণের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ করে সাম্রাজ্য-বিরোধী সংগ্রামের সূচনা করে। কৃষকরাই ছিল ভারতীয় জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের আদিপর্বে তারাই ছিল চালিকা শক্তি। ১৭৭৬ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত বাঙলাদেশে ঔপনিবেশিক ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ কৃষক ও আদিবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছিল।'[১৯] তাই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস। ভারতীয় কৃষকদের বাদ দিয়ে ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা কখনো সম্ভব নয়। এ দেশের কৃষক সমাজ ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনকে প্রথম থেকেই মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারে নি। এ দেশের উৎপীড়িত কৃষক সমাজ ইংরেজের অসম শাসনে অসন্তুষ্ট হয়ে নানা সময়েই খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের জন্ম দেয়, যা পরবর্তীকালে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে থাকে। 'ঔপনিবেশিক সরকারের কৃষক-স্বার্থ বিরোধী ভূমিনীতির বিরুদ্ধে···হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের মধ্যে'[২০] বেশ কটি উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। যেমন:

১। ১৭৮৩ সালে রঙপুরের সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ। ২। ১৭৯৩ সালে জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ। ৩। ১৮২৫-এ গারো এবং

শ্যাজংদের বিদ্রোহ। ৪। ১৮৩১ সালে ২৪ পরগণায় ওয়াহাবী বিদ্রোহ। ৫। ১৮৩৮ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অংশে খণ্ড বিচ্ছিন্ন ছোট-বড় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর থেকেই ভারতের কৃষকের মুক্তি সংগ্রামের প্রত্যক্ষ দিকটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এর আগে কিংবা পরে বিভিন্ন কৃষক আন্দোলনে এমন ব্যাপকহারে কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ লক্ষ্য করা যায়নি। গোটা উনিশ শতক জুড়ে কৃষক নানা ভাবে তার স্বাধিকার রক্ষার লড়াই চালিয়ে গেছে। বলাই বাহুল্য, কৃষক জাগরণের ভিতর দিয়েই এদেশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক চেতনার দিকটি মূর্ত হয়ে ওঠে।

এদেশের জমিদার ও সামন্ত ভূস্বামীদের পক্ষে ইংরেজ শাসনের প্রয়োজন ছিল যথেষ্টই। চাহিদা তো থাকারই কথা। কারণ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ এ দেশের জমিদার শ্রেণী আগের চেয়ে অনেক বেশী ধনী হয়েছে, তাদের ধনাগমের অনিশ্চিয়তাও কেটে গেছে, এমন সুখের অবস্থায় তারা ইংরেজ বিরোধিতা করবেন কোন মূঢ়তায়? আপামর জনসাধারণকে ইংরেজ যথাসাধ্য শোষণ করছে আর জমিদারকেও শোষণ করার সুযোগ দিয়েছে, অতএব ইংরেজ ও দিশি জমিদার তো একপক্ষে থাকবেই।'[২১] তাইতেই তো ইংরেজ শাসনের অনুগত হয়ে এবং ইংবেজ প্রশাসনকে খুশী করে, তাঁরা এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে কুক্ষিগত করার পথ খুঁজেছেন। দেশীয় জমিদারদের মনোগত ইচ্ছাই ছিল ইংরেজ শাসন স্থায়ী হোক। এজন্যেই তো লর্ড কর্ণওয়ালিশ এদেশের ভূস্বামীদের লাভজনক সম্পত্তি বলে বিবেচনা করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ লর্ডের এমন গভীর চিন্তার অর্থ-ব্যঞ্জনা কি এদেশের ভূস্বামীরা বুঝতে পারেনি? হয়তো পেরেছিল। কিন্তু স্বার্থের খাতিরে সবকিছু বুঝেও তাঁরা বৃটিশ শাসনের বিরোধী ভূমিকা নিতে পারেননি। অথচ এদেশের উৎপীড়িত নিরক্ষর কৃষকের বুঝতে অসুবিধা হয়নি ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ কি? সে জন্যেই তাঁরা প্রথম থেকেই ইংরেজ-বিরোধী ভূমিকা নিতেই বাধ্য হয়েছিলেন।

ভারতের কৃষক বিদ্রোহগুলি কোন আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয়। ইংরেজ শাসনের ভেতরে যে অসহনীয় দিকটি ছিল—তার বিরুদ্ধেই কৃষকের মরণ-পণ লড়াই। কৃষক-শোষণের মূল নীতিকে সহ্য করার মতো মানসিকতা কোন কৃষকেরই ছিল না। তাই কৃষকের পঞ্জীভূত ক্ষোভ দিনে দিনে

বেড়েছে—বই কমেনি। বিদ্রোহ থেকে বিপ্লবে রূপান্তরিত হতে বেশী বিলম্ব ঘটেনি।[২২] যদিও ভারতবর্ষের কৃষক বিদ্রোহগুলি প্রথমে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আরম্ভ হলেও, তা কখনো কখনো বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ ভাবে 'কোন ব্যক্তি যখন কৃষকদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করেছেন, ঐক্যবদ্ধ করেছেন জমিদারের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে, তখনই দীর্ঘদিনের জমাট বাঁধা ক্ষোভ গণ-অসন্তোষরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।'[২৩]

এ ধরণের গণ-অসন্তোষের দৃষ্টান্ত বড় একটা কম নয়। উনিশ শতকে অসন্তোষেব উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তো বাঙলার নীল-বিদ্রোহ। যে গণ-অসন্তোবের বহিঃপ্রকাশ ভারতের ধর্মঘটগুলিকে দৃঢ়তা দান করেছে, তার মধ্যে বাঙলার কৃষকদের নীল-ধর্মঘট 'তদানীন্তন যুগ পরিবেশে নতুন ধরণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সচেতন মানসিকতা সৃষ্টিতে' অনস্বীকার্য ভূমিকা নেয়। উনবিংশ শতকে ভারতের কৃষক আন্দোলনে যে ধর্মঘটটি শ্রমজীবী মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনাকে উজ্জীবিত করতে পেরেছিল, সে ধর্মঘটটি ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের অমৃত ফল। যে অমৃত ফলের অপর নাম—বাঙলার 'নীল বিদ্রোহ নয়—নীল ধর্মঘট।'

ক.

ভারতের কৃষক ধর্মঘট :

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ পরিবর্তন আনে এদেশের কৃষক সাধারণের চেতনায়। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষের শাসনভার সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ শাসনাধীন হলে, ভারতীয়দের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এখান থেকেই বিদেশী ও স্বদেশীয়দের মধ্যে একটা বৈরীভাবের সৃষ্টি হয়। খানিকটা বিকেন্দ্রিত ও উদ্দেশ্যহীনতা সত্ত্বেও সমাজের বিভিন্ন স্তরে এ-আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী হয়েছিল বলতেই হয়।[২৪] বিশেষ করে উৎপীড়িত কৃষকেরা এ আন্দোলনে সামিল হলেও, তা যথার্থ কৃষক বিদ্রোহের চরিত্র নিতে পারেনি। অনেক গবেষকের মতে মহাবিদ্রোহে কৃষক বা শ্রমজীবী মানুষের কোন সোৎসাহ সহযোগিতা ছিল না। এই জন্যেই 'তখনকার কালের কৃষক ও সিপাহীদের চেতনা ছিল নিম্ন স্তরের। তাঁদের বিক্ষোভ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কৃষক ও সিপাইদের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহকে স্থানীয় সামন্ত প্রভুরা দেশীয় রাজা-জমিদার-তালুকদার প্রভৃতিরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগিয়েছিল।'[২৫] ফলে কৃষকের বিদ্রোহী চেতনা সম্প্রসারিত

হতে পারেনি। এও সত্য যে এই বিদ্রোহের সঙ্গে ভারতের সমস্ত কৃষককের যোগাযোগ ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বই ভারতীয় কৃষকদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তবুও এই বিদ্রোহে 'সারা ভারতের কৃষক জনসাধারণই ছিল এই বিদ্রোহী বাহিনীর সত্যিকারের সিপাহী।'[২৬] এই বিদ্রোহের প্রভাব পরবর্তীকালের কৃষক বিদ্রোহগুলিকে দৃঢ়তা দান করেছিল তো বটেই; সেই সঙ্গে বিদেশী শাসককের দীর্ঘ শোষণ-উৎপীড়ন-নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিক্ষুব্ধ মানসিকতাই ভারতের গোটা কৃষক সমাজের সুপ্ত শক্তিকে সর্বাত্মকরূপে জাগিয়ে তুলেছিল।[২৭]

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ কার্যত: ব্যর্থ হলেও, এর মহান শিক্ষা জন সাধারণের ভিতরে এক নবচেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। বিশেষ করে মহাবিদ্রোহের বছর তিনেক পরে এ দেশের নীল চাষীরা নীলকরদের বিরুদ্ধে এক কাট্টা হয়ে যে সংঘশক্তির পরিচয় দেয়, এর আগে এমনটি আর কোন আন্দোলনেই দেখা যায়নি। বলা বাহুল্য, এখান থেকেই এদেশের কৃষকেরা বৈপ্লবিক উদ্যোগ, দুর্জয় সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে থাকে। নীল চাষ নিয়ে বাঙলায় নীল-করদের ভূমিকা কেমন ছিল? এখন তার আলোচনাতেই আসা যাক।

নীলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় না থাকলেও, শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই পরিচয় আছে 'নীলদর্পণ' নাটকের সঙ্গে। নীল চাষ এখন আর হয় না। কিন্তু নীলের স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি। নীল ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। এদেশে নীল চাষ শুরু করেছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। কারণ বিদেশে নীলের চাহিদা ছিল যথেষ্ট। আর এদেশে নীলচাষের সুবিধাও ছিল অনেক। জল-বায়ুও ছিল অনুকূল। সেই সঙ্গে সস্তায় মজুরও মেলে। এইসব ভেবে-চিন্তে নীলচাষের অর্থনীতি ইউরোপীয়দের লোভী করে তোলে। নীলচাষের লাভ-লোকসান সম্পর্কে জানাতে গিয়ে তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন: 'নীল আমাদের একটা অত্যন্ত মূল্যবান রপ্তানি পণ্য। ইংলণ্ডে ও বিদেশে এটা একটা মূল্যবান বস্তু। ভারতের নদীয়া ও যশোহরে যে নীল হয় তা বোধ হয় পৃথিবীতে সব থেকে ভাল।.....ভারতের এই অংশে প্রতি বছর গড় পড়তা ১,০৫,০০০ মণ নীল রং প্রস্তুত হয়, আর তার দাম ২ কোটি টাকা অথবা ২ মিলিয়ন পাউণ্ড।[২৮] এজন্যেই নীলচাষের ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা এত আগ্রহী ছিলেন। যাঁরা নীলের ব্যবসা করতেন তাঁদের নীলকর বলা হতো। আর যাঁরা নীল চাষ করতেন

তাঁদের নীল রায়ত বলা হতো। নীলচাষে নীলকরদের লোভ দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। কারণ, নীল ব্যবসায় 'টাকায় টাকা লাভ'।

এখন লাভ-ক্ষতির হিসাবটা মিলিয়ে দেখা যাক না! এক বিঘা জমিতে নীল হয় দশ বোঝা। দশ বোঝা নীলে পাঁচ সের নীল উৎপন্ন হয়। পাঁচ সের নীলের দাম দশ টাকা অর্থাৎ ১ সের নীল ২ টাকায় বাজারে বিক্রি হতো। এই দশ বোঝা নীলের জন্যে চাষীর হাতে আসতো দু-টাকা আট আনা। দশ বোঝা গাছ থেকে যে নীল তৈরি হতো তার জন্যে নীলকরের খরচ মাত্র এক টাকার মতো।[২৯] হিসেব মতো নীলের মুনাফা আকাশ ছোঁয়া। সেই নীল বিষ হয়ে উঠেছিল বাঙলার নীল চাষীদের কাছে। মুনাফার লোভে রায়তদের চোখ রাঙিয়েই নীল চাষ করতে বাধ্য করেছেন শাদা চামড়ার নীলকর সাহেবরা। চোখ রাঙালেই যেখানে পকেট ভর্তি হয়ে যায় কাঁচা টাকায়, সেখানে চোখ রাঙানো সবচেয়ে সহজ উপায়। নীলচাষী নানা কারণেই নীলচাষে অবাধ্য হয়েছে। আর তার ফলে রায়তদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তার নিষ্ঠুরতা ভাবাই যায় না। প্রহার, কয়েদ, লুণ্ঠন, গৃহদাহ নৃশংস ও অমানবিক অত্যাচারে অনেক রায়ত ধনে-প্রাণে নিঃশেষ হয়ে গেছে।[৩০] এমন কি নীলকরদের হাত থেকে জমিদারেরাও রেহাই পায়নি।

সেকালের নীল চাষের জ্বালা, বড় জ্বালা। যে জ্বালার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে কৃষকদের সংঘবদ্ধ চেতনা কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল—তা আজ আর কারোই অজানা নেই।

নীল চাষের প্রথমদিকে নীলচাষীদের অবস্থা ভালই ছিল। চাষীদের স্বাধীনতাও ছিল। পরে নীলকরেরা রায়তদের সে স্বাধীনতা খর্ব করতে শুরু করেন। "স্বাধীনভাবে রায়তরা নিজেদের জমিতে অন্য ফসল উৎপাদন করতে পারলে যা লাভ করতে পারতো—বাধ্যতামূলকভাবে নীলচাষের দরুণ সেখানে রায়তদের কোন লাভই থাকতো না। ফৌজদারী আদালতের নথীপত্রগুলি থেকে এই বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক চাপের দিকটি প্রমাণিত হয়। যে মুহূর্তে বোঝা গিয়েছিল যে, রায়তেরা আইনত ও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ব্যক্তি—সেই মুহূর্তেই অর্থনৈতিক অতিচাপের বেষ্টনী ভঙ্গ করার দিকে তাঁরা ঝুঁকেছিল।"[৩১] সে ঝোঁকের প্রবণতায় নীলকরেরা খুন-জখমেরও আশ্রয় গ্রহণ করতে ইতস্তত: করে নি। ১৮০৭ সালে ফ্রেডরিক মেটল্যাণ্ড

আর্ণট নামে একজন নীলকর সাহেব দু-জন রায়তকে নীল না বোনার অপরাধে প্রকাশ্যেই খুন করে। রায়তরাও আর্ণটকে ছাড়েনি, উত্তেজিত কৃষকরাও তাঁকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে।[৩২] নীলকর ও নীলরায়তের মধ্যে সম্পর্কটা দিনে দিনে তিক্ততার দিকেই পৌঁছেছে। কিন্তু এই তিক্ততা কেন? এমন একটা সময় এসেছিল যখন অর্থনৈতিক দিকে থেকে রায়তের জীবনে দুর্ভাগ্য ঘোর হয়ে উঠেছিল। নীলকরদের হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছিল রায়তের জীবন-মরণ। তারা দিনে দিনে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে শুরু করেছিল কেবল উৎপীড়নের জন্যই নয়। কেন না, তখন 'রায়তের পক্ষে নীলচাষ ছিল সম্পূর্ণভাবে লোকসানজনক আর তার পরিবারের পক্ষে তার অর্থ হতো অনশন। নীলকরদের উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট, একেবারে নিম্নতম খরচে, অথবা কোন খরচা না করেই সর্বোচ্চ মুনাফা করা। নীলচাষীকে সে নামমাত্র মূল্যটাও না দিয়ে নীল গাছগুলি নিয়ে নিত। আর যদি ঐ নামমাত্র মূল্যটা চাষীকে দেওয়াও হতো; তাহলে নীলচাষ চাষীদের পক্ষে হতো অনেক ক্ষতিকর। তারপর আবার এই নামমাত্র মূল্যটা থেকে অনেক-কিছু কাটা হতো—আমলারা তাতে এত বেশি ভাগ বসাত এবং নীলগাছ ওজন করবার সময় এত অসম উপায় অবলম্বন করা হতো যে এই নাম মাত্র মূল্যটাও শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছত। রায়ত যদি কোনো মতে নীলের জমি থেকে আর কিছু না হোক, অন্তত খাজনাটাও তুলতে পারত তাহলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করত।...আরও দেখতে হবে যে যখন আর সব দ্রব্যের দাম দ্বিগুণ, কিংবা প্রায় তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে, তখন নীলের জন্য যে দাম দেওয়া হতো অথবা নাম মাত্র দেওয়া হতো, তা এক পয়সাও বাড়েনি।'[৩৩] সারা বছর খেটেখুটে রায়তদের শূন্য হাতে ঘরে ফেরাই তাদের সংঘাতের ও সংঘর্ষের মুখোমুখী নিয়ে যেতে বাধ্য করে। নীল চাষীদের এই দুর্বার অবাধ্য আন্দোলনের মধ্যেই জন্ম নেয় স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট। যে ধর্মঘট কৃষক-সম্প্রদায়কে মুক্তি সংগ্রামের দিকে যেতে উদ্বোধিত করেছে।

কৃষক-শোষণ এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল যার প্রতিকার না করে পারেনি বাঙলার নীল রায়তেরা। নীলকরদের কাছে নীল একটা প্রধান অর্থকরী কৃষিসম্পদ হয়ে ওঠায়, শাসনযন্ত্রও তাদের সর্ববিধ সহযোগিতা করেছে। নীলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বয়ং গভর্ণর বাহাদুরও স্বপ্ন দেখে বলেছিলেন 'আমরা এই উচ্চ আশা পোষণ করি যে এই দ্রব্যটি আমাদের প্রভূত পরিমাণে লাভের

উৎস স্বরূপ হবে।'[৩৪] লাভের উৎস খুঁজতে অত্যাচারই একমাত্র উপায় ভেবে নিয়ে নীল চাষে যত রকম ঝামেলার সৃষ্টি করেছিল নীলকরেরা। নীলচাষের অর্থনৈতিক বৈষম্যই নীলচাষীদের ধর্মঘট পালনে প্রেরণা যোগায়। কৃষকদের দেশব্যাপী এতবড় একটা সংগ্রাম নিশ্চয়ই একদিনে হঠাৎই হয়ে যায়নি। এর জন্যে কৃষকদের বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে এদেশের একদল বুদ্ধিজীবীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এই আন্দোলন গোটাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রচুর সভা-সমিতি, মিছিল মিটিং প্রভৃতির মধ্যে দিয়েই নীলকর বিরোধী একটি পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে এবং নীলধর্মঘট সফল হয়। নীলকর বিরোধী এই আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে দ্বিধা কিংবা কোন সংশয় ছিল না। খ্রীশ্চানদেরও ভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিশেষ করে পাদ্রী লঙের নেতৃত্ব ভোলার নয়। তিনি বলতে গেলে রায়তদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিবাদ করেছেন, নীলকরদের অমানবিক কাণ্ডকারখানাগুলির প্রতি—সিপাহী বিদ্রোহে যাঁরা নীরব থেকেছেন ; তাঁরাই গর্জে উঠেছেন নীলের মুখে আগুন দিতে।

এ আন্দোলনে হরিশ মুখুজ্জ্যে ছিলেন একাই একশো। নীলকর বিরোধী আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকায় নীলকরেরা আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। নীলকরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে গিয়ে হরিশ্চন্দ্র একটি সাংবাদিক বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা কেবল সাংবাদিকতাই করেননি; যথার্থ সংবাদ পরিবেশন ছাড়াও রায়তদের সংঘবদ্ধ করার কাজেও অগ্রণীর ভূমিকা নেন। বিশেষ করে যশোরের শিশিরকুমার ঘোষ,নদীয়ার দীনবন্ধু মিত্র ও মনোমোহন ঘোষ, কৃষ্ণনগরের দারোগা গিরিশচন্দ্র বসু, নদীয়া স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আর মিশনারী খ্রীশ্চানদের মধ্যে হার্সেল-সৌটনকার-লাসিংটন ও রেভাঃ জেমস্ লঙের জোরালো প্রতিবাদ বৃটিশ প্রশাসনকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। যার ফলে মিশনারীদের সঙ্গে নীলকরদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। নীলকরদের বিষয়ে যে সব মন্তব্য মিশনারীরা করেন—সে সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়ে নীলকরেরা বলতে শুরু করেন যে এসব তথ্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কিন্তু নীলকরদের অভিযোগ ধোপে টেঁকেনি। তাঁরা গ্রামগঞ্জ ঘুরে হাতে নাতে দৃষ্টান্ত তুলে ধরে প্রমাণ দিয়েছেন নীলকর ও নীল কমিশনদের সামনে। এর ফলে মিশনারীদের সঙ্গে নীলকরদের সম্পর্ক খারাপের দিকে চলে যায় এবং উনিশ শতকের মধ্য ভাগেই

এই তিক্ততা চরমে ওঠে।[৩৫]

বৃটিশ প্রশাসন নীলকরদের পক্ষ নিয়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছেন, অন্যদিকে কোন মতেই রায়তদের অভিযোগ কানেই নেয়নি। অপরদিকে নিত্য নতুন আইন তৈরি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের পঙ্গু করে তোলা হয়। কত রকম আইন, কত রকম চুক্তি,—যে সব চুক্তি কার্যতঃ অর্থহীন। তবুও নীলচাষীদের বাধ্য করা হয়েছে সেই সব চুক্তি মানতে। চুক্তিগুলি এই রকম: চাষীর জমি নীলকরদের মাপতে দিতে হবে। মাপা জমিতে চাষী নীল বুনতে বাধ্য থাকবেন। নীলকরের কাছ থেকেই নীলের বীজ ক্রয় করতে হবে। নিড়াণ দিতে হবে। ফসল কাটতে হবে, আবার সেই ফসল অর্থাৎ নীল গাছগুলি নিজের খরচে নীলকুঠিতে কিংবা নীলের কারখানায় পৌঁছে দিতে হবে।[৩৬]

জমিদাররাও এই সব যুক্তিহীন চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে রাজী হলেন না। তাঁরাও রায়তদের সঙ্গে নীলকরদের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। গ্রামে গ্রামে জোরদার গণসংগঠন গড়ে উঠে। দীর্ঘকালের ক্রীতদাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে অধীর হয়ে ওঠে বাঙলার অসহায় মূঢ় মূক নীলচাষীদের দল। নীলকর বনাম নীল-রায়তের দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। বুদ্ধিজীবীরাও মরিয়া হয়ে ওঠেন। তাঁরাও সবিশেষ উপলব্ধি করতে পারলেন: 'রায়তরা যদি আর কিছু দিন এভাবে প্রতিরোধ করতে পারে তাহলে তাদের সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে যে গণআন্দোলন সংগঠিত হবে তা দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করতে পারবে।'[৩৭] সত্যিই নীলচাষীদের একাট্টা মনোভাবে প্রশাসনের কর্তা-ব্যক্তিরাও মহাচিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। ভীত সন্ত্রস্ত হয়েই নীল চাষীদের পক্ষে বাঙলার ছোটলাট এসলি ইডেন একটি পরোয়ানা জারি করে জানান: 'নিজের জমিতে নীল চাষ করা বা না করা কৃষকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। নীল চাষ করানোর জন্যে তাদের উপর কখনও জোর জুলুম চলবে না। এমন কি থানা পুলিশের সাহায্যও নিতে পারবে না।[৩৮] এসলি ইডেনের এই পরোয়ানার, সুযোগ নিয়ে দীর্ঘদিনের অত্যাচারিত কৃষিজীবী সমাজ 'আর নীল নয়'—এই প্রতিজ্ঞায় বুক বেঁধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নীল ধর্মঘটে সামিল হলেন।

সেদিন নীলের পীঠস্থান ছিলো নদীয়া, মালদা, মুর্শিদাবাদ, যশোর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চল। এই সব অঞ্চলের কৃষকদের নীল ধর্মঘটের মধ্য দিয়েই

আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে। দিকে দিকে কৃষকের ধর্মঘট এক নজির বিহীন দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। তাঁদের একটাই বক্তব্য—আমরা আর জীবনে নীলচাষ করবো না।

করবো না বললেই তো হবে না। ছাড়ছে কে? নীলকরেরা মরণ কামড় দেবেই। কারণ ১৮৬০ সালের আইন মাফিক চুক্তির বিরোধিতা করলে কারাদণ্ড ও জরিমানা হবে। ১৮৬০ সালের এই ১১ আইন—Act XI of 1860—৪ঠা এপ্রিল থেকে ৩রা অক্টোবর, ১৮৬০ পর্যন্ত, মাত্র ছয় মাস বলবৎ থাকবে। ফলে, 'যদি কোনো কৃষক নীল চাষের জন্য দাদন নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে ও তদনুসারে নীল চাষ না করে তাহলে শুধুমাত্র নীলকরের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ৩ মাসের জন্য জেল দিতে পারবেন এবং যদি কোনো ব্যক্তি কৃষককে নীলচাষ না করতে প্ররোচনা দেয় তাহলে তারও কারাদণ্ড ও জরিমানা হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের এই রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আপীল করা চলবে না।'[৩৯] এটা আইন নয়। আইনের নামে প্রহসন।

আইন যখন হয়েছে এবং আইন যখন আছে তাকে কাজে লাগিয়েই জোর-জবরদস্তি চাষ করাতে বাধ্য হলেন নীলকরেরা। নীল যে একটা সম্পদ-বিশেষ। এ থেকে মুনাফা তাঁদের চাই-ই-চাই। ১১ আইনে কৃষকদের চাষ করাতে তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অপর পক্ষে চাষীরাও তাদের প্রতিজ্ঞায় অচল-অনড়। ফলে কাগজ-কলমের বেআইনী এই আইন নিয়ে গ্রামে গ্রামে শুরু হয়ে যায় 'নীলকর, পুলিশ ও আদালতের তাণ্ডব।' নীলকরদের মুখের কথাতেই সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকেই চার দিনের মধ্যে ১৯টা মামলায় তদন্ত শেষ করে শাস্তি দেওয়া হোল রায়তদের।[৪০] অথচ নীলকরদের বিরুদ্ধে আদালত কোন শাস্তি তো দূরের কথা—টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলো না।

নীলকর ও প্রশাসনের এই অবৈধ কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে কৃষকরা আরো উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। হাজার হাজার কৃষক গ্রামে গ্রামে ধর্ম-ঘট স্থাপনা করে নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, ধর্মের নামে তাঁরা শপথ নিলেন, জীবনে আর কখনো নীলচাষ করবে না। নীল কমিশনের সামনেও তাঁরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—আমরা যে ধর্মঘট করেছি তা ভাঙার সাধ্য পৃথিবীর কোন শক্তির নেই। নীল ধর্মঘটের উপর আস্থা রেখেই বেশ কিছু সংখ্যক রায়ত ভয়-ভীতি ও অত্যাচারের সব আশঙ্কা ত্যাগ করে বলতে বাধ্য হয়ে—

ছিলেন নীল-কমিশনের সামনে :

দিনু মণ্ডল—আমার গলা কেটে ফেললেও আমি নীল বুনবো না……বরং মৃত্যু স্বীকার করবো, তবু নীল বুনবো না।

জমির মণ্ডল—আমি এমন দেশে চলে যাব যেখানকার লোক নীল কখনও চোখে দেখে না বা নীল বোনে না।

হাজি মোল্লা—বরং বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাব তবু নীল বুনবো না। ভিক্ষা করে খাবো তবু নীল বুনবো।

কবি মণ্ডল—আমি কারো জন্যেই নীল বুনবো না, এমন কি বাপ-মার জন্যও না।

পাঞ্জু মোল্লা—আমাকে গুলি করে মেরে ফেলুন, তবু আমি নীল বুনব না।'[৪১]

এমন সব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রায়তদের কোন আইন দিয়ে কিংবা জোর জবরদস্তি চাষ করানো সম্ভব নয়, তা কমিশন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নীল-চাষীদের বাধ্য করা যাবে না চাষের জন্যে। এবারের আন্দোলন আগের মতো খাপছাড়া বা খণ্ড বিছিন্ন নয়। দেশে দেশে সর্বত্র সংগঠিত আন্দোলনের একই আওয়াজ 'আমরা আর নীল বুনবো না।' শুধুমাত্র কৃষকরাই নয়, তাঁদের সহযোগী বুদ্ধিজীবীরাও এগিয়ে এলেন সংগঠিত আন্দোলনকে আরো জোরদার করার উদ্দেশ্য নিয়ে। বিশেষ করে শিশিরকুমার ঘোষ এ-সময়ে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা প্রশংসনীয়। তাঁরই চেষ্টায় নীল ধর্মঘটের ব্যাপ্তি ঘটে। শত চেষ্টা করেও নীল ধর্মঘট থেকে বিরত করা গেল না ঐক্যবদ্ধ লক্ষ লক্ষ কৃষককে। তাই ১৮৬০ সালের এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব বঙ্গদেশের কৃষক সমাজই সৃষ্টি করেছিল।

এই নীলধর্মঘট ভাঙতে অসমর্থ হয়েছিলেন নীলকরেরা। কেন তারা ব্যর্থ হয়েছেন সরেজমিনে তা দেখে ছোটলাট জে. পি. গ্রান্ট অবাক হয়েছিলেন। ১৮৬০ সালের আগষ্ট মাসে ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে নির্মাণের কাজ দেখতে তিনি যাচ্ছিলেন নদীপথ কুমার ও কালীগঙ্গা দিয়ে। যাওয়ার পথেই তিনি নীলচাষীদের সংঘবদ্ধ ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সংগঠনী শক্তিতে বিস্মিত না হয়ে পারেননি। তিনি স্বয়ং চোখে দেখা সে অভিজ্ঞতার কথা লিখছেন এইভাবে : 'যাবার পথে অসংখ্য রায়ত বিভিন্ন স্থানে জমায়েত হয়ে প্রধানতঃ দাবী জানাচ্ছিল যে সরকার হুকুমজারি করে নীলচাষ বন্ধ করে দিক। কয়েকদিন পরে আবার যখন কুমার ও কালীগঙ্গা দিয়ে ফিরছিলাম, তখন এই ৬০।৭০ মাইল পথে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নদীর দুইধারে অসংখ্য জনতা জমায়েত

হয়ে বিচার প্রার্থনা করছিল, এমন কি গ্রামের মেয়েরাও স্বতন্ত্রভাবে জমায়েত হয়েছিল। দুই পাশের বহুদূরের গ্রামগুলি থেকেও প্রচুর লোক এসেছিল। ১৪ ঘণ্টা ধরে অবিরাম এইরূপ জন সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গমন করা ও তাদের বিচারের দাবী শোনা আর কোনো সরকারী অফিসারের ভাগ্যে ঘটেছিল কিনা আমি জানি না। তারা সকলেই সম্ভ্রমশীল, সংকল্প-নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিচ্ছিল। যদি কেউ ভাবেন যে সহস্র সহস্র নরনারী ও বালক-বালিকাদের এইরূপ মনোভাব প্রদর্শনের কোনো গভীরতর তাৎপর্য নেই তাহলে তাঁরা মারাত্মক ভুল করবেন। দেশের এক বিরাট অঞ্চলব্যাপী এই অসাধারণ জনসমাবেশ একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে প্রকার সংগঠনের শক্তি ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেখিয়েছে তা গভীর ভাবে চিন্তা করার বিষয়।'[৪২] এ চিন্তা জে. পি. গ্রাণ্টের একার নয়। সেকালে নীলাচাষের এই সংকট ও সমস্যাটি নিয়ে অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। অনেকে উদ্বেগ ও সংশয় প্রকাশ করেছেন।

নীলচাষ চিরতরে বন্ধ করার জন্যই একটা সর্বাত্মক গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই গণআন্দোলন থেকেই জন্ম নিয়েছি নীলধর্মঘটের। তবে এ কথাও ঠিক নীলধর্মঘটে ছোটলাট জে. পি. গ্রাণ্টের নীলকর বিরোধী আচরণই বাঙলার নীলরায়তকে 'নীলধর্মঘটে' প্ররোচিত কবেছিল।[৪৩] সেই সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট এসলি ইডেন-কৃত ইস্তাহারও নীল রায়তদের ধর্মঘটের দিকে যেতে উৎসাহিত করে।

আগেই বলেছি ১৮৫৯ সালে ২০ শে ফেব্রুয়ারী এসলি ইডেন পরোয়ানা জারি করে জানিয়ে ছিলেন যে, নীল চাষ করা না করা রায়তের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। এতে কৃষকদের মনের বল বৃদ্ধি পেয়েছিল শতগুণ। নীল চাষ বন্ধের পক্ষে এ যেন একটা রক্ষা কবচ হয়ে উঠেছিল।

এসলি ইডেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট মাত্র হলেও কর্মজীবনে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক। যে দক্ষতার গুণে তিনি পরবর্তীকালে বাঙলার গভর্ণর পর্যন্ত হতে পেরেছিলেন [১৮৭৭—১৮৮২]। এসলি ইডেন স্বচক্ষে নীলকরদের অত্যাচার দেখেই নীলকর বিরোধী ভূমিকা নিতে তৎপর হয়েছিলেন। ইডেনের এই কর্মতৎপরতায় নীলকরেরা রুষ্ট হয়ে ওঠেন, তারা ইডেনের বিরুদ্ধে নদীয়া নীল কমিশনের আর্থার গ্রোটের কাছে একের পর এক অভিযোগ পেশ করতে শুরু করেন।[৪৪] অভিযোগে তাঁরা জানান যে ইডেন

রায়তদের পক্ষ নিয়ে, রায়তকে রক্ষা করার জন্যে জমিতে পুলিশ পাঠাচ্ছেন। যা আগে দেখা যায় নি। নীলকরদের অভিযোগগুলি জেনে গ্রোট সাহেব নীলকরদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে ইডেনের কাছে আবেদন জানান। নীলকর বিরোধী কোনকাজ না করতে অনুরোধ করেন। গ্রোটের কথা ইডেন মানলেন না। গ্রোটের সঙ্গে ইডেনের মনোমালিন্য তুঙ্গে উঠে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি গভর্ণর জেনারেল জে. পি. গ্রান্টের কাছে পৌছায়। এবং তিনি আগেই বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন। নীলকরেরা যা করেছেন বা করতে চাইছেন তা সম্পূর্ণ অন্যায় তো বটেই, সেই সঙ্গে দেশ শাসনের পক্ষেও ক্ষতিকর। তাই জে. পি. গ্রান্টও ইডেনের সুচিন্তিত কাজকে সমর্থন না জানিয়ে পারেননি। সেই সঙ্গে ইডেনের নীলকর বিরোধী কাজগুলোকেও অনুমোদন করলেন। ইডেনের নীলকর বিরোধী ঘোষণাপত্রটিই ভারতে কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে,কৃষকদের ধর্মঘটের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দলিল,এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে জন্যই তো নীল কমিশনের সামনে রেভা: লঙ্ সাহসের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন : 'I believe the perwannas of the Magistrate [Mr Eden] have been only the occassion that has brought matters to a crisis and shewed the ryots that it was the wish of the Government to deal impartially with the question.'[৪৫]

ইডেনের বিরুদ্ধে নীলকরদের বিদ্বেষ খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু জে.পি. গ্রান্টের বিরুদ্ধেও তাঁদের কুৎসিত মন্তব্য শোনা গেছে। ইডেনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করতে গিয়ে একটা গোটা বই লিখে ফেলে নীলকরেরা ইডেন-বিরোধী প্রচারে উঠে পড়ে লেগেছিল। নীলধর্মঘট সৃষ্টির জন্যে ইডেন সাহেবকেই দোষী সাবস্ত করে *Brahmirs and Pariahs* গ্রন্থের যে পরিচ্ছেদটি লিখেছিলেন তার শিরোনাম দিয়েছিলেন : 'The Hon'ble Mr. Magistrate Eden excites a Strike'. নীলকরেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ইডেনকে নীল-ধর্মঘটের জন্যে দায়ী করে একটি Impeachment-এর দাবী করে বসেন।[৪৬]

নীলকরদের দাবী যতই জোরালো হোক না কেন। প্রজাদের সংগঠিত প্রতিবাদ সুদূর ইংলণ্ডেশ্বরীর কানেও পৌছাতে বাকী রইলো না। নীল-ধর্মঘটের বহু ঘটনা তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার ফলে কৃষকরা যেমন খুশী হয়েছেন, অপরদিকে নীলকর ও সরকার বিপন্ন বোধ করেছেন। নীলকরেরা নিজেদের বাঁচার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন

করেছেন। কারণ নীলচাষীদের অসহযোগিতার ফলেই নীলের অর্থনীতি ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে থাকে। তাকে প্রতিরোধ করার মতো কোন ব্যবস্থা নীলকর বা সরকার—কোনপক্ষেই করে উঠতে পারেনি। ধর্মঘট ভাঙার জন্যে মূলতঃ সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। সৈন্য-সামন্ত কিংবা পুলিশ ব্যবহার নীলধর্মঘটের বিরুদ্ধে তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি। যেটুকু নিয়েছিল তা কার্যতঃ নিষ্ফল। কারণ এই আন্দোলন তখন আর খণ্ড-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল না। এ-প্রকাশ্যেই রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে মোড় নেয়। এই আন্দোলনকে সর্বাত্মক নয় বলে ঘোষণা করেছেন ঐতিকহাসিক ড. রমেশ মজুমদার। তিনি ধর্মঘটকে Passive Resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন[৪৭] বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু এ-মন্তব্য যথাযথ নয় বলেই মনে হয়। এ আন্দোলনের প্রাণশক্তি যে কৃষক এবং তাঁদের যে ধর্মঘট সারা দেশে ব্যাপ্তি লাভ করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নীলধর্মঘট যদি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন হয়ে থাকে, তাহলে এই আন্দোলনেব ফলে প্রশাসনও ভীত হয়ে উঠতেন না। তাঁরা রায়তদের দমন করতে গোলন্দাজবাহিনীকে নিযুক্ত করতেন না।

তিতুমীরের সক্রিয় সংগ্রামের ফলে নীলবিদ্রোহ সারাদেশে সশস্ত্র বিদ্রোহের আকার নিয়েছিল। কৃষকেরা নীলকর এবং বৃটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে যদি না সক্রিয়ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতেন, তাহলে নীলধর্মঘটের সফলতা তো দূরের কথা নীল আন্দোলন ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ইতিহাসে যথার্থই নিষ্ক্রিয় আন্দোলনের অপবাদে ভূষিত হত। কিন্তু এই ধর্মঘটের "অন্তর্নিহিত অসাধারণ ও অপরাজেয় বৈপ্লবিক শক্তি[৪৮] এদেশের কৃষকের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষকে প্রেরণা যুগেছে ভাবীকালের বিপ্লবগুলিকে সফল করে তুলতে। সেজন্যেই ১৮৬১ সালের মার্চ মাসের 'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে' The Samash in the Indigo District নামক একটি লেখায় নীলধর্মঘট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে যা বলেছেন তা যথার্থ: 'ভীতি প্রদর্শন ও অত্যাচার সত্ত্বেও নীলচাষীদের এই সর্বাত্মক ধর্মঘট জয়যুক্ত হয়েছে। বিদ্রোহের আগে তারা ছিল দাস, এখন তারা স্বাধীন।'[৪৯] নীলধর্মঘট তাই নিষ্ক্রিয় আন্দোলনের দৃষ্টান্ত নয় বরং বিদ্রোহের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচক',[৫০] যা আগামীকালের সংগ্রামী জনতার কাছে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে উজ্জল হয়ে আছে।

ভারতে শিল্পের বিকাশ ও শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব

প্রচীন ভারতের অর্থনীতি ছিল মূলতঃ কুটিরশিল্প কেন্দ্রিক। সেকালের কুটির-শিল্পগুলি ছিল সামাজিক বর্ণ ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে বৃত্তির যোগ ছিল অবিচ্ছেদ্য। বর্ণব্যবস্থার কঠোরতার ফলে প্রাচীন কুটির শিল্পের নিযুক্ত বর্ণগোষ্ঠী নিজেদের 'দৃঢ়মূল বংশগত বৃত্তিভিত্তিক জাতি-বর্ণভেদ ব্যবস্থার'[১] বাইরে যেতে পারেননি। সেকালে তাই জাতিগত বৃত্তিনির্ভর সমাজ গড়ে উঠেছিল সারা ভারতবর্ষেই। কুটিরশিল্পগুলিও তাই 'বর্ণ-ব্যবস্থা বা সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।'[২] প্রাচীন ভারতে কুটিরশিল্পগুলিতে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের অবকাশ ছিলও না। তাঁদের 'আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অপরিবর্তিতই থাকে।' জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে তাঁরা ন্যূনতম নিরাপত্তা খুঁজে পেতেন। ফলে কুটির-শিল্পের অর্থনীতিই তাদের সারা বছরের নুন-ভাতের সমস্যাটুকু মেটাতে অন্য কোন বৃত্তির দ্বারস্থ হতে দেয়নি।

ভারতবর্ষের অতীত গৌরব ছিল তাঁতবস্ত্রের জন্যেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় তাঁতবস্ত্রের অসাধারণ চাহিদাও ছিল; বিশেষ করে বাঙলার তাঁতিদের দ্বারা প্রস্তুত মস্‌লিন। একমাত্র একটি হিসাবেই দেখা যাচ্ছে যে, '১৬০০ খ্রীস্টাব্দেই ২৪২ লক্ষ টাকার মসলিন রপ্তানি হয়েছে।[৩] ভারতের তাঁত শিল্প বংশানুক্রমিক শিল্প হওয়ার ফলে, অষ্টাদশ শতকের বাঙলা দেশে ও করমণ্ডলের গ্রামগুলিতে সব বয়সেরই লোকজনেরা কাপড় তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিল।[৪] সেকালের কুটির শিল্পে তাঁত বস্ত্র গ্রামীণ অর্থ-নীতিকে নিয়ন্ত্রণের কাজে গুরুত্ব নিয়েছিলো। অষ্টাদশ শতকে মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি পরগণায় নিযুক্ত তাঁতিদের মোট জনসংখ্যাই প্রমাণ করে দেয়, সেকালের কুটির শিল্পগুলির অর্থনীতিতে কি ভূমিকা ছিল :[৫]

পরগণা	মোট তাঁতি পরিবার	উন্নতমানের কাপড় প্রস্তুতকারক পরিবার	নিম্নমানের কাপড় প্রস্তুতকারক পরিবার
নারায়ণগড় ...	৯৪ ...	... ১৩ [১৩·৮৩] ...	...৮১ [৮৬.১৭]
সান্দর ...	৩০১ ...	... ১৫১ [৫০·১৭] ...	...১৫০ [৪৯·৮৩]
জালকাপুর ...	৮	×	৮
প্রতাপপুর ...	১০৫	৫ [৪·৭৬] ...	...১০০ [৯৫.২৪]

ভূমস্তা	...	৫০	×	৫০
ঝাতুরা বাহার	...	৫০	×	৫০
দস্তামোতা	...	৩৮	৩৪ [৮৯·৪৭]	৪ [১০·৫৩]
কেদার	...	৪৬	৯ [১৯·৭৫]	৩৭ [৮০·৪৩]
বলরামপুর	...	৪৯	৩৯ [৭৯·৫৯]	১০ [২০·৪১]
খড়গপুব	...	৩৫	×	৩৫
ধারিন্দা	...	১৩	×	৩৫

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে প্রমাণিত হয় যে মধ্যযুগের মুসলিম শাসনে কুটির শিল্পে নিয়োজিত পরিবাবের আর্থিক সঙ্গতি রক্ষা হয়েছে হস্ত চালিত তাঁত শিল্প থেকে। তাই পেট পুরে দু-বেলা মাছ ভাত ডালের কোন অসুবিধা হয়নি। কারণ কুটির শিল্পে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্রের বাজার মূল্য খুব একটা খারাপ ছিল না। যেমন :

দ্রব্য	হার	বাজার মূল্য
মখমল	প্রতি থান	৪ হতে ৫ মোহর
বনাত	থান	১৷. " ৫ "
সালু	থান	৩ " ২ "
ছিট	এক হাত	১৬ " ১ টাকা
পশমী বনাত	"	২৷৷. " ৪ মোহর
লাহোরী বনাত	১ থান	২ " ৪ "
শাল	থান	২ " ৮ "
শালের ফতুয়া	১ টা	৷. " ৩ "
শালের জামার জন্যে টুকরো	১ থান	৷৷. " ৪ "
পটু	১ "	১৲ " ১০ টাকা
লই	১ "	৷/.১২" ৪ টাকা[৬]

অতএব দেখতে পাচ্ছি যে, এই কলকাতাতেই মাসিক ৫ টাকা ৬ টাকার মতো আয়ের এক জন সাধারণ কারিগরের অবস্থা খুব একটা খারাপ ছিল না। গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে মাসিক আয় কম ছিল। তাতেই জীবিকার ক্ষেত্রে দারুণ কোন সংকট দেখা দেয়নি।[৭]

কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিষয়ে সেকালের বণিকদের ভূমিকাও ছিল যথেষ্ট। বণিকরাও বংশানুক্রমিক ভাবেই দেশ-বিদেশে বাণিজ্যতরী নিয়ে

ব্যবসা-বাণিজ্য করে দেশীয় অর্থনীতির ভিত্তিকে শক্ত করে গড়ে তুলতে পেরেছে। বণিকদের সঙ্গে সেকালের কুটির শিল্পজাত পণ্য সামগ্রী বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই দেশের অর্থনীতি পরিপুষ্ট হয়েছে।

শিল্পনীতির বিবর্তন :

প্রাচীন ভারতের অপরিবর্তিত অর্থনীতির ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ভারতে ইংরেজ আগমনের পরেই। যে ভারতের অর্থনীতিতে কুটির শিল্প ও কৃষি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত ছিল তা ইংরেজের হস্তক্ষেপে নিশ্চিহ্ন হতে বাকী রইলো না। বিশেষ করে তাঁতীদের উৎখাত করার সঙ্গে সঙ্গে 'ছোটো ছোটো অর্ধবর্বর, অর্ধসভ্য গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়ে তার অর্থনৈতিক ভিত্তিকেও গুঁড়িয়ে দিতে চাইলেন। নিজেদের স্বার্থেই তার অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তারা তাঁদের অর্থনৈতিক দিকের পরিবর্তন ঘটাতে চাইলেন নিজেদেব ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়েই'।[৮] তাঁরা এ দেশের আবহমান কালের ব্যবসা-বাণিজ্যকে লাটে তুলে দিয়ে, নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যকে স্ফীত করে তুলতে নানারকম কৌশল অবলম্বন করেন। যে ভারতবর্ষ এক কালে রপ্তানীকারক দেশ ছিল, সেই দেশই কোম্পানীর রাজত্ব কালেই আমদানীকারক দেশে পরিণত হয়। অর্থাৎ কোম্পানীর রাজত্ব কালে কৃষি ও শিল্পের যুগ্ম সম্মিলনে দেশের অর্থনীতিকে স্ফীত করে তোলার বদলে, ইংরেজের বৈষম্যমূলক নীতি দারিদ্র্যকেই স্বীকার করে নিতে ও ভারতীয় শিল্পগুলি অনিবার্য ধ্বংসের পথে যেতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের একচেটিয়া বাজার দখলের যেমন সুবিধা পেয়েছে, তেমনি তার আর্থিক সঙ্গতিও দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে শিল্প-বিপ্লবের পথেও সে এগিয়ে গেছে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই ভারত ইংলণ্ডের তৈরি পণ্য সামগ্রীর বাজার ভাল ভাবেই পেয়ে গেছে। যে বাজার সম্পর্কে কার্ল মার্কস লিখেছিলেন: '১৮২৩ সালেই যে বিনিময় হার ছিল সাধারণত টাকায় ২ শিঃ ৬ পেঃ তা নেমে গেল ২ শিলিঙে। অবিস্মরণীয় কাল থেকে দুনিয়ার সুতি মালের বৃহৎ কারখানা ভারতবর্ষ, এবার ভেসে গেল ইংরেজি টুইষ্ট ও সুতি বস্ত্রে। ভারতের নিজস্ব উৎপন্নকে ইংলণ্ড থেকে বহিষ্কৃত করা বা কেবল অতি কঠোর সর্তে প্রবেশানুমতি দেবার পর বৃটিশ কারখানার মাল অল্প এবং নাম মাত্র শুল্কে প্লাবিত হতে

থাকল ভারতে, যার ফল তার একদা অতো বিখ্যাত দেশীয় সুতি বস্ত্রের ধ্বংস'।[১] ভারতের বংশানুক্রমিক শিল্পের ধ্বংস এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে সামগ্রিক অনুপ্রবেশের মধ্যে দিয়ে, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতকে করলো কাঁচা মালের উৎপাদনশীল দেশ, অন্যদিকে ইংলণ্ড সেই কাঁচা মালের দ্বারা বৃহৎ শিল্প-উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠলো। ইংলণ্ডে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর মূল বাজার হোল ভারতবর্ষ। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উক্ত অর্থনৈতিক চিন্তা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ১৮১৮ সালে হঠাৎ তারা পূর্বেকার ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে এ দেশের কাঁচা মালে, এ দেশেই পণ্য তৈরি করার একটি নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন। ফলে, ভারতে যন্ত্র শিল্পেরও প্রসার ঘটাতে, তাঁদের নয়া অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট করে তুলতে, এ দেশেই তৈরি করলেন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। যা ভারতে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এ দেশে প্রথম তৈরি হলো একটি সুতার কল। যে সুতাকলটি আজো বেঁচে আছে ইতিহাসের গৌরবময় স্মৃতি নিয়ে, 'বাউড়িয়া কটন মিল' নামে। বৃটিশ পুঁজিতে গড়া এই কলের প্রথমে নাম ছিলো 'ফোর্ট গ্লস্টার মিলস্'। ভারতের প্রথম শিল্প প্রতিষ্ঠানটি চালু হতে ১৮১৯ সাল নাগাদ কর্মচারী হিসাবে বহু নারীশ্রমিকও এসেছিলেন ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে। কিন্তু তাঁরা বেশীদিন কাজ করতে পারেন নি। যন্ত্রের সঙ্গে লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে তাঁরা অতি দ্রুত মৃত্যু বরণ করেন।

ভারতে শিল্প-বিকাশের প্রচেষ্টা :

ভারতবর্ষ শিল্প-বাণিজ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠুক, এ প্রচেষ্টা সেকালের অনেক প্রগতিশীল ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীরা মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। তাঁরা এ-দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে বহুমুখী পরিকল্পনার কথা চিন্তা করেছিলেন। রামমোহন ও দ্বারকানাথ অবাধ বাণিজ্যনীতির কথাও ব্যক্ত করেন। তাই তাঁরা মনে করতেন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা অবাধে ব্যবসায়ের অধিকার পেলে তবেই দেশ বাণিজ্যে ও শিল্পে সমৃদ্ধ হতে পারবে। কিন্তু এ দেশের স্বাধীন ব্যবসা ও বসবাসের ক্ষেত্রে আইনগত যে সমস্ত অসুবিধা আছে তা দূর না হলে বাণিজ্যের উন্নতি ও তৈরি মাল উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। অবাধ বাণিজ্য-নীতির প্রবক্তরা মনে করতেন, অর্থনীতির নিয়মে প্রতিযোগিতার ফলে

পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলে এদেশের কৃষি মজুরেরাও ভালো মজুরি পেতে পারবে এবং নিঃস্ব ভূমিজীবীর উপর অত্যাচার বা শোষণের মাত্রাও যাবে কমে। দ্বারকানাথ মনে করতেন ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ইউরোপীয়ানদের অবাধ যোগাযোগ ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে মূলধনের মালিক বিদেশীয় হলে এ দেশের শিল্পের প্রভূত কল্যাণ হবে। এই সব ভাবনা-চিন্তাই এ দেশে আধুনিক শিল্প-বিকাশের সূচনা ঘটায়।

সমকালীন বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভারতে শিল্প বিপ্লবের পক্ষে যে সব মতামত ব্যক্ত হতে দেখা যায়, তা মূলতঃ একচেটিয়া বাণিজ্যনীতির বিরুদ্ধে এবং অবাধ বাণিজ্যনীতির স্বপক্ষে। সে জন্যেই তাঁরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ছাড়াও সভা-সমিতির মধ্য দিয়েই কোম্পানীর একচেটিয়া শিল্পনীতির বিরোধিতা করেছেন এবং অবাধ বাণিজ্যনীতির পক্ষে তাঁদের মতামত ছিল জোরালো। তাঁরা মনে করতেন দেশে শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই এ-দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। শিল্প-বিকাশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্যনীতিই ভারতের পক্ষে একান্ত কাম্য।

কিন্তু এই অবাধ বাণিজ্যে কি যে ক্ষতি হতে পারে সে নিয়ে সে সময়ে অনেকেই চিন্তা করতে পারেনি। কারণ এতে সুফল হওয়ার চেয়ে পরবর্তী-কালে কুফলগুলিই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এতে 'ভারতের বাণিজ্যিক ও অর্থ-নৈতিক সর্বনাশ' ঘনিয়ে আসে। যাঁরা এই নীতির সমর্থনে আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন, তাঁরা তেমন কোন সুবিধাজনক পরিস্থিতি গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে 'ভারত একদিকে শিল্পোন্নত বৃটেনের কৃষিখামারে পরিণত হয়েছে, অপর দিকে বৃটিশ শিল্পজাত পণ্যের নির্ভরযোগ্য বাজারে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতের এই পরিণতিতে পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন রামমোহন, দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমারের নেতৃত্ব'।[১০]

এদেশে আধুনিক শিল্প-বিকাশের ভিতর দিয়েই একটি নতুন শ্রেণীর জন্ম হয়, যাঁরা শিল্প শ্রমিক নামে পরিচিত হন। আর এই শ্রমিকদের শোষণের ভিত্তিভূমি হয়ে উঠলো এক-একটি শিল্প কেন্দ্র। এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের শোষণের মধ্যে দিয়ে বৃহৎ পুঁজিবাদীর চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এদেশে শিল্প বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটেছিল, তার সুফলগুলি ভারতের জনগণের স্বার্থে ব্যয়িত হয় নি। কারণ অবাধ বাণিজ্যনীতি পরোক্ষভাবে সম্প্রসারিত হয় 'ইংলণ্ডের

নবোদ্ভূত শিল্প ও বাণিজ্যের সংকীর্ণ স্বার্থে। সৃষ্টি হয়েছে ভারতের বস্ত্র ও তাঁত শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারিগরদের অবর্ণনীয় দুর্দশা।[১১]

'ভারতের বিপুল জনগণের মধ্যে প্রভূত শিল্প ক্ষমতা বর্তমান থাকলেও' ভারতীয় উদার নীতির সমর্থকরা পুঁজি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। একমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টাই এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আর কোন ভারতীয় এ-বিষয়ে তেমন উৎসাহ দেখায় নি। দ্বারকানাথের বাণিজ্য প্রচেষ্টা ও সাংগঠনিক শক্তি দেখে স্বয়ং উইলিয়াম বেন্টিক উৎসাহের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে দ্বারকানাথের উদ্যোগই প্রথম। অপরপক্ষে এদেশের শিল্প-প্রসারের সুযোগ নিয়ে সরাসরি শিল্প উৎপাদক গোষ্ঠী হতে পারতেন যাঁরা তাঁরা অনেকেই ভারতে ইউরোপীয়ানদের 'এজেন্ট'-এর ভূমিকা নিয়ে মুনাফা অর্জনের পথ অন্বেষণ করেছেন, আর কিছু অংশ জমিদার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। ফলে, গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় পুঁজির জন্ম ও বিকাশের পথ স্বাভাবিক ভাবে রুদ্ধই ছিল বলা যেতে পারে।

রেলপথ : শিল্প-বিকাশের নব দিগন্ত :

ভারতের তুলা উৎপাদন কেন্দ্রগুলির অভূতপূর্ব সাফল্য ও তুলা উৎপাদনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখে বৃটিশ-প্রশাসন ভারতে রেলপথ নির্মাণের জন্যে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। অনেক ভাবনা-চিন্তার শেষে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে কুড়ি মাইলের মতো রেলপথ নির্মিত হয়। অবশ্য ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা ও দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ইংলণ্ডে একটি রেলওয়ে কোম্পানী গঠন করা হয়েছিল যার নাম হয়েছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী। এক কোটি পাউণ্ড মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে রেল ব্যবস্থার জনক জর্জ ষ্টিফেন্‌সের ভ্রাতুষ্পুত্র স্যার রোল্যাণ্ড ম্যাক ডোনাল্ড ষ্টিফেনসের নেতৃত্বে ঐ রেলওয়ে সংস্থাটি গঠিত হয়। বোম্বাইতে সাফল্যের পরই বাঙলাদেশের কয়লাখনি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে রেললাইন পাতার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ তৈরি করার অনুমোদন মেলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে রেল পাতার কাজ শুরু হয় এবং ১৮৫৭ সালের মধ্যে ২৮৮ মাইলের মতো তৈরি হয়ে রেলপথ এদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ

করে তোলে।

'শিল্পের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বস্তুটির পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুগম করার জন্য রেলপথের এত প্রয়োজনীয়তা ইংরেজ কোম্পানী অনুভব করেছিল। রেলপথ চালু হওয়া এবং তার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ দেশে সংগঠিত ভারী শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ অনেক বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের পথে এগোতে থাকল এ দেশের প্রাচীন গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি তথা প্রাচীন ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগগুলি'।[১২] পরবর্তীকালের সুফল এদেশের জনগণ পেলেও, ভারতে বৃটিশ তার শোষণ-কৌশলটিকে রেল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আরো পাকা করার চেষ্টা করে। রেলপথ তৈরি করে জনগণের প্রভূত উপকার সাধনের চেয়ে, শোষণের দিকটিই যেন বেশী প্রকট হয়ে ওঠে। এর ফলে সেকালের লোকের মনে একটা আশঙ্কা কাজ করে। এমন আশঙ্কার দৃষ্টান্ত মেলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত'র তৃতীয় পর্বে: 'কর্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ী চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেচে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে। শুধুমাত্র এই হেতুই ভারতের দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলপথ বিস্তারের আর বিরাম নাই।'

রেলপথের পরোক্ষ ভূমিকা যাই হোক না কেন—দেশের অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গলই হয়েছে বেশী। রেলপথের দ্বারা আর যা কিছু অমঙ্গল ঘটুক না কেন, শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে ভারতে রেলপথের বিস্তারের পরোক্ষ ভূমিকাটি ভারতবাসীর পক্ষে কল্যাণকরই হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল মার্কস তাঁর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা যে তথ্যটি পরিবেষণ করেন, তা এক্ষেত্রে কতখানি বাস্তবমুখীন দেখা যেতে পারে: 'ইংরেজ মিলতন্ত্রীরা ভারতকে রেলপথ বিভূষিত করতে ইচ্ছুক শুধু এই লক্ষ্য নিয়ে যাতে তাদের কল কারখানার জন্যে কম দামে তুলা ও অন্যান্য কাঁচা মাল নিষ্কাশিত করা যায়। কিন্তু যে দেশটায় লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের যাত্রায় [locomotion] যদি একবার যন্ত্রের প্রবর্তন করা যায় তাহলে সে যন্ত্র তৈরির ব্যবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। রেল চলাচলের আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যা দরকার সে সব শিল্প-কারখানার ব্যবস্থা না করে বিপুল এক দেশের ওপর রেলপথের জাল বিস্তার করে রাখা যাবে না এবং তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব শাখায় যন্ত্রের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই হবে ভারতের সত্যিকার আধুনিক

শিল্পের অগ্রদূত'।[১৩]

ভারতের প্রগতিতে ও শিল্প বিকাশের স্বার্থে রেল ব্যবস্থাই প্রকৃতপক্ষে নিজেই একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে পড়ে। এবং রেল স্থাপনের পক্ষে 'শিল্পপতিরাও ভারতকে একটি উৎপাদনশীল দেশে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে'।[১৪] রেলপথ যথার্থই এ দেশের শিল্প বিকাশের রূপায়ণে এক বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। শুধু কি এই? রেল ব্যবস্থায় ভারতে জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ না হলেও, জাতিভেদ সমস্যা যে লঘু হয়ে পড়েছিল এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতে রেলপথের সাফল্যে বাঙালী কবিরাও ইংরেজের প্রশংসা না করে পারেনি:

'মানব জনম হায় সার্থক হে আজ—
সাবাস্ বাষ্পীয় রথ সাবাস্ ইংরাজ'।[১৫]

রেলগাড়ীর প্রশংসার সঙ্গে এ দেশে বিজাতীয়দের উদ্যোগ এবং উদ্যমকেও স্বাগত জানানো হয়েছে 'ভারতভূমি' নামক একটি কবিতায়:

'পুরাতন কীর্তি যত
সকলি হয়েছে হত
নূতন যা কিছু দেখ বিজাতি স্থাপিত।'[১৬]

সত্যিই এ দেশে: 'বাণিজ্যিক ও সামাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্যে রেলপথের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।'[১৭]

রেল-সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেকালেই অন্যান্য শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে রেলের গতির সঙ্গে ভারতে শিল্প বিকাশের গতিটিও লাগামহীন হয়ে ওঠে। বিশেষ ভাবে '১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী অভ্যুত্থানে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছিল—ভারত সরাসরি ইংরেজ সরকারের শাসনাধীন হয়েছিল—তার দু-বছর আগেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে তাদের পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা আরও পাকা করে ফেলে'।[১৮] এ-প্রসঙ্গে আরো বড় কথা হোল রেল লাইনগুলি তৈরি করার জন্যে কোন আর্থিক ঝুঁকির প্রশ্ন বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ছিল না। রেল লাইনের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের সঙ্গে সরকারের আর্থিক উন্নয়নও ঘটে। কৃষি, সামরিক, পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য শিল্পের সহযোগী হিসাবেও রেল বেশ বড় ভূমিকা নিয়েছে। রেলপথের সঙ্গেই বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠলে, কেবল শাদা চামড়ার সাহেবরাই উপকৃত হয়নি এদেশের

অসংখ্য জনগণও প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কাজে-কর্মে এর ভালোমন্দের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। রেল ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখতে এ-দেশে উদ্ভূত হয়েছে এক শ্রেণীর শ্রমিকের, যাঁরা রেলের প্রথম যুগের কর্মী হিসাবে ভারতে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবর্তী বাহিনী।

বৃটিশ-ভারতে শিল্প-বিকাশ ঃ শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঃ

প্রাচীন ভারতেও যে শ্রমজীবী মানুষ ছিল না এমন নয়। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে—ভারতের কুটির শিল্পগুলিতে বহু সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। যারা 'ভারতে বংশানুক্রমিক ও বৃত্তিভোগী গ্রাম কারিগর' হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আমরা রেলপথ কিংবা ইংরাজের কলকারখানায় সংগঠিত শ্রমিকের যে দৃষ্টান্ত দেখি, তা মুঘল যুগেও দেখা যায়। কিন্তু নানা কারণেই তা স্থায়ী হয় নি। আগে সুযোগ ছিল না অধিক সংখ্যক লোকের একই জায়গায় দীর্ঘকাল ধরে সংগঠিত ভাবে কোন কাজ করার। হয়তো বা কোথাও দীর্ঘস্থায়ী কাজের সুযোগ ঘটলেও বেশী দিন কাজ করা কারিগরদের পক্ষে সম্ভব হোত না। গোলকুণ্ডার বিখ্যাত হীরের খনিতে দীর্ঘকালীন কাজের সময় সম্পর্কে জানা যায় ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্রের গবেষণা থেকে। গোলকুণ্ডার হীরের খনিতে নাকি প্রায় ৩০ হাজার লোক কাজ করত। কাজের পদ্ধতি আদিম ধরণের ছিল। মাটির উপরেই কাজ হতো বা মাটি একজন আরেকজনের উপর বসে তুলত। ভূগর্ভস্থ খননের কোনো কায়দা ছিল না। জায়গা মেপে খনিটা নানা লোককে ইজারা দেওয়া হতো। ফলে একটি সংগঠনের অধীনে অতগুলো লোকের কাজ হতো না। বিশেষ দক্ষতার দরকার নেই বলে বহু সময় লোক এই বৃত্তি ছেড়ে চাষে চলে যেত'।[১৯] এ থেকে স্পষ্ট যে প্রাচীন ভারতেও গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষও অনেক সময় একই জায়গায় বাঁধা পড়েছে। কিন্তু সুষ্ঠু উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত না হওয়ার ফলে, শিল্প-বিকাশের পথ উন্মুক্ত হতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে দক্ষতা ও কারিগরি জ্ঞানের প্রশ্নটিও ওঠে।

কয়লাখনিগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্তরায় ছিল যন্ত্রপাতির কোন ব্যবস্থা ছিল না বলে। আর এই যন্ত্রায়ন সম্ভব না হওয়ার ফলে অধিক সংখ্যক লোকজনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এই শিল্পে। নারী পুরুষ উভয়েই খনিতে কাজের সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু কোন খনিতে মালিকের নিজস্ব শ্রমিক সংখ্যা অপ্রতুল। প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প লোক নিয়োগের কারণ

একটাই। ঠিকাদারদের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেওয়ার ফলে, এই শিল্পে নিযুক্ত লোকদেরও যেমন উন্নতি হয় নি, তেমনি তারা সংগঠিত হওয়ারও তেমন সুযোগ পায়নি।

চটকলগুলির ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। একদা চট শিল্পও বস্ত্র শিল্পের মতো কুটির শিল্পের অধীন ছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক চট শিল্পের জন্ম হয়। হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের কাছে রিষড়ায় শ্রীলঙ্কার এক কফি বাগিচার মালিক জর্জ অক্ল্যাণ্ড প্রথম একটি চটকল প্রতিষ্ঠা করেন। যার নাম ছিল 'রিষড়া ইয়ার্ন মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড।' সেকালে এই চটকলটি দক্ষ শ্রমিকের অভাবে ধুঁকছিল বটে কিন্তু ধীরে ধীরে শ্রমিকদের একাগ্রতা ও অভিজ্ঞতায় এই শিল্পটিও প্রসারিত হয় বাঙলাদেশের হুগলী নদীর দু-তীর জুড়ে। ত্রিশ বছরের মধ্যে চটকলের সংখ্যা চব্বিশে পৌঁছায়।

রেল-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষেই দ্রুতগতিতে শিল্পের ক্রমঃপ্রসার লক্ষণীয়। বিশেষ করে লৌহ ও ইস্পাত অর্থাৎ খনিজাত শিল্প সারা ভারতে প্রসারলাভ করে। কাগজ শিল্পও পশ্চাদপদ ছিল না। ভারতে বৃটিশ যুগে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার যেমন ঘটেছে তেমনি দিনে দিনে শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়াও আমরা জানি যে, বৃটিশ পুঁজিতেই ভারতে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা ঘটে। এবং রেলপথ নির্মাণের ফলে শিল্প বিকাশের গতি কেউ রুদ্ধ করতে পারে নি, পারা সম্ভবও হয় নি। এর ফলে ভারতের শিল্প সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েছে বই কমেনি। চা বাগিচা, কফি, রাবার, কয়লাখনি, চট, সুতিবস্ত্র প্রভৃতি শিল্পের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যের জোয়ার এসেছে। এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক ভাবে বহু মজুর ও শ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছে। বৃটিশ পুঁজিতে পরিচালিত শিল্প-সংস্থাগুলিতে বহু মজুর ও শ্রমিকের বিনিয়োগ কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার হিসাব মেলে একটি সরকারী তথ্য থেকে। যেমন বয়ন ও চট শিল্প-গুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর যে হারে বৃদ্ধি ঘটেছে তা এই রকম: ১৮৭৯-৮০ সালে ৫৮টি কাপড়ের কলে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩৯,৫৩৭, ১৮৮৪-৮৫ সালে ৮১টি কাপড়ের কলে ৬১,৫৯৬ জন শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছেন। চটকলের ক্ষেত্রেও ১৮৭৯-৮০ সালে কারখানা ছিল ২২টি এবং তার শ্রমিক সংখ্যা ছিল ২৭,৪৯৪ জন, সেই সংখ্যা ১৮৮৪-৮৫তে ২৪ টি কারখানায় ৫১,৯০২।

বৃটিশ পুঁজিতে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষেরাই বৃটিশ পুঁজিকে সমৃদ্ধ করেছে

নানা ভাবে। এই সমৃদ্ধির কারণ ভারতের এই উপনিবেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা মাল ও সস্তায় মজুর পাওয়ার ফল। কিন্তু ভারতে বৃটিশ পুঁজিতে শিল্প বিকাশ ঘটলেও, শিল্পে নিযুক্ত কুলি-মজুর তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে প্রতি মুহূর্তে। কুলি-মজুর ছাড়া শ্রমিকের সম্মান তাদের কপালে জোটেনি। কুলি-মজুরের জীবন নিয়েই শিল্প সংগঠনগুলিতে দুঃসহ জীবন কাটাতে হয়েছে ভাবীকালের সংগঠিত শ্রমিক সঙ্ঘের জন্মের অপেক্ষায়।

৭.

ভারতের শ্রমিক সংগঠন

ভারতে শ্রমিক শোষণের চালচিত্রের ইতিহাসটি কমদিনের নয়। ভারতে শ্রমিক শোষণের অসহনীয় দিকটি শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের অনেকখানি অধিকার করে আছে। সেকালে শ্রমিকের ইতিহাস ক্রীতদাসের ইতিহাস। একজন শ্রমিক ও একজন ক্রীতদাসের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। তফাৎ ছিল না চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেও। সেকালে শ্রমিকের দাসত্বের পরিণাম এত কঠোর ও করুণ ছিল যে অনেক শ্রমিককে আত্মহত্যার ভেতর দিয়ে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে হয়েছে। মালিকগোষ্ঠী বাড়তি সম্পদ সংগ্রহের ও মুনাফার প্রয়োজনে একজন শ্রমিককে যে ভাবে জুলুমের জাঁতাকলে পিষ্ট করার ভূমিকা নিয়েছিল, তা থেকে সহজে মুক্ত হওয়া ভারতীয় শ্রমিকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁদের কাছে উৎপাদন ব্যবস্থায় একজন শ্রমিক যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রমের বিনিময়ে পুঁজি বৃদ্ধি করাটাই মালিকের কাছে ছিল একমাত্র লক্ষ্য। মালিকের অন্যায় জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতের অসংগঠিত শ্রমিকের ন্যায্য অধিকারের সংগ্রাম কোনভাবেই দানা বাঁধতে পারেনি, তাই শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণ সেকালে কোন ভাবেই সম্ভব হয়নি।

মালিকের পক্ষে জুলুম করা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার—অপরদিকে শ্রমিকের পক্ষে প্রতিবাদ করা ছিল অস্বাভাবিক। পুঁজিপতির অবিরাম চাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার মতো শক্তি ও সাহস না থাকার ফলে মালিক পক্ষের শ্রমিক শোষণের অপচেষ্টা ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছে। 'সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত' শ্রম দিয়ে পুঁজিপতি তার সম্পদ গড়ে তুলতে শ্রমিক শোষণের নীতিকে বহাল রাখার চেষ্টা করেছে। আজ অবশ্য শ্রমিকের রক্ত ও ঘামে ভেজা বন্দী জীবন শেষ হয়েছে। সেদিন পরাধীন জীবনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ ছিল না, কোন বিদ্রোহ ছিল না, মৌন মূক মূঢ় দুঃসহ অবস্থায় কাল কাটাতে হয়েছে তাঁদের। শ্রমিকের জীবনের যেন কোন মূল্যই ছিল না। সেকালে শ্রমিকের পক্ষে ধর্মঘট শব্দটি উচ্চারণ করা ছিল চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয়। ধর্মঘট পালন করে দাবী আদায়ের পথটি সহজসাধ্য ছিল না। সংগঠিত হওয়ার কোন অবকাশও ছিল না। কারণ সে সময়টি ভারতীয় শ্রমিকের জন্মের সন্ধিকাল। সে সময়ে ভারতে বৃটিশ শাসন যে পরিমাণে দেশীয় শিল্প-সংগঠন ধ্বংস করছিল, ঠিক সেই পরিমাণে ইউরোপীয় ধরণের

আধুনিক শিল্পকারখানা গড়ে ওঠেনি। যেটুকু আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল, তাতে সমগ্র দেশের শ্রমজীবী শ্রেণীর জীবিকা নির্বাহ হয়েছে তাদের 'সংখ্যা পূর্বকার শিল্পজীবীদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প'।[১] ফলে ভারতীয় শ্রমিক সংঘবদ্ধ প্রেরণা থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ড, জার্মান, ইটালি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে একই সঙ্গে নবজাগরণের সূচনা হলে ঐ সব দেশের শ্রমিক শ্রেণী একটি বিশেষ শৃঙ্খলায় সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে শ্রমিক সংঘই তাঁদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে একটি সফল ভূমিকা নেয়। কিন্তু ভারতীয় শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এ-ধরণের কোন ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি। ভারতের শ্রমিকের সংঘবদ্ধ শ্রেণীচেতনা ও বিপ্লবী আদর্শের প্রেরণা সর্বত্রই অনুপস্থিত থেকে গেছে। সেকালে শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে বড় অন্তরায় ছিল পরিপুষ্ট রাজনৈতিক চেতনার অভাব। উপযুক্ত শিক্ষা ও সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের অভাব তো ছিলই। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন তৈরির ক্ষেত্রে যে ধরণের তাৎপর্য লক্ষিত হয়েছিল, ঠিক সে ভাবে শ্রমিক সংগঠনের তাৎপয ভারতীয় শ্রমিকের কাছে ছিল না।

ভারতের শিল্প বিকাশের প্রথম যুগে শ্রমিক কল্যাণে ভারতের সমাজ-হিতৈষী সংস্থাগুলির ভূমিকাই ছিল মুখ্য। ভারতের শ্রম কল্যাণের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে শ্রমিকের অর্থনৈতিক উন্নতি ও ন্যায্য অধিকার অর্জনের কোন যোগসূত্র ছিল না। সামাজিক-ক্রিয়া কর্মের ভেতর দিয়ে ভারতীয় শ্রমিক তার অধিকার ও মুক্তির পথটি খুঁজে পেয়েছিল। বিশেষ করে ১৮৫৭-র মহা-বিদ্রোহের সম-সময়ে বাঙলার কৃষক বিদ্রোহের বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীকে সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে। ভারতে বৃটিশ শাসনে গণআন্দোলনগুলি ছিল মূলতঃ ভূমিকেন্দ্রিক। এ দেশের কৃষকই ছিল সমস্ত আন্দোলনের চালিকা শক্তি। পরবর্তীকালে ভারতের সর্বস্তরের মানুষের মতো কৃষকরাও ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছে'।[২] মহাবিদ্রোহের মূল শক্তি ছিল উৎপীড়িত সিপাহী ও কৃষক সম্প্রদায়। এরা নীল বিদ্রোহের সময় এক কাট্টা হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করেছে নীলকর ও নীল চাষের বিরুদ্ধে। তাদেরই সংঘবদ্ধ চাপের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল নীলকর সাহেবরা। এ আন্দোলনের প্রতিরোধ—

মূলক ব্যবস্থা হিসাবে ধর্মঘটই ছিল মুখ্য প্রেরণা। অপর দিকে ১৮৬০ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে জমিদারদেরও উৎপাত বেড়ে যায়। ফলে দিকে দিকে প্রজা-বিদ্রোহ একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। খাজনা বৃদ্ধির অত্যাচারে তো পাবনার প্রজা বিদ্রোহ একটি ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হয়। পাবনার কৃষক প্রজারা কোন অবস্থাতেই জমিদারদের অন্যায় জুলুম মেনে নেয়নি। সিরাজগঞ্জের অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট পিটার নোলান সাহেব পাবনার প্রজা বিদ্রোহের ভূমিকা প্রসঙ্গে লেখেন যে, জমিদারদের উৎপীড়ন, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ প্রভৃতি সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ কৃষক প্রজারা সাফল্যের সঙ্গে তার বিরোধিতা ও মোকাবিলা করেছিল।[৩] বহু অঞ্চলের প্রজারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিপ্লবী সমিতিও গড়ে তুলেছিল। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম যুগে এ ধরণের আন্দোলনগুলির প্রভাব সত্ত্বেও কিন্তু এদেশের শ্রমিকরা সংগঠিত হতে পারেনি। সংগঠন তৈরি তো দূরের কথা।

ভারতে শ্রমিক সংগঠন 'শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর' রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভারতে শ্রমিক সংগঠনের জন্ম সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের মধ্য দিয়ে। সেকালের শ্রমিকদের সংগঠিত করা সহজ ছিল না। নানা সামাজিক সমস্যা অর্থাৎ জাত-পাত ও বর্ণের গোঁড়ামী শ্রমিকদের সংগঠিত করার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় ছিল। সেকালে শ্রমিকদের সংগঠিত করতে বিপ্লব বা গণ-আন্দোলনের কোন দৃষ্টান্ত মেলে না। ভারতে শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক মঙ্গলের ধারা থেকে উদ্ভূত। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ভিতর দিয়েই শ্রমজীবীর স্বার্থ-সংরক্ষণের প্রশ্নটি সক্রিয় হয়ে উঠে। যিনি শ্রমিকদের সার্বিক উন্নতিতে যাবতীয় প্রচেষ্টার সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন, তিনি হলেন বরানগর অঞ্চলের শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ভারতে শ্রমিক সংগঠনের স্রষ্টা হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বরানগরের বোর্ণিয় জুট কোম্পানির শ্রমিক কর্মচারীদের আত্মিক উন্নতিতে একক উদ্যোগে শ্রমিক কল্যাণের মহান কাজটি শুরু করেছিলেন শশীপদ। ১৮৬৬ সালে ১লা নভেম্বর তাঁরই উদ্যোগে শ্রমিকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। যা ভারতের প্রথম শ্রমিক জমায়েৎ বলে উল্লেখ করেছেন গোপাল ঘোষ।[৪] এই সভা কোন রাজনৈতিক সভা ছিল না। শ্রমিকদের ব্যবহারিক জীবনের পরিবর্তন ঘটাতে এবং শ্রমিকদের নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দিতে সভা-সমিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই এই সভার

আয়োজন হয়। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত কু-অভ্যাসগুলি দূর করতে বিভিন্ন শিক্ষামূলক আলোচনা সভা সহ শ্রমজীবীদের স্বার্থে সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের কথা তিনি চিন্তা করেন। শশীপদবাবু ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের জন্যে যে প্রয়োজনীয় শিক্ষার দরকার তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না বটে, তথাপি একালের ট্রেড ইউনিয়নের সৃষ্টির পথিকৃৎ হিসাবে তাঁর অবদান সর্বজন স্বীকৃত। ১৮২৭ সালে পাল্কি বেয়ারাদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করেই ভারতের উপার্জকশ্রেণী সহ শ্রমজীবী মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতা একটু একটু বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় থেকেই এদেশের কয়েকজন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টি পড়ে অবহেলিত শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের দিকে। ১৮৫৭ সালের পরে সংগঠিত ধর্মঘটগুলির মধ্যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদের একটা চেতনা প্রলেতারিয়েত সমাজের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে উঠতে থাকে।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দক্ষিণারঞ্জন, অক্ষয় দত্ত ও হরিশ মুখার্জী প্রমুখের বক্তব্য শোষিত ও মেহনতি মানুষের স্বপক্ষে ঘোষিত হলেও, সমাজতন্ত্রের পক্ষে তাঁরা তেমন কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে সমাজ সচেতনতা সজীব হলেও, তাঁর বক্তব্য খুব একটা সমাজতান্ত্রিক নয়। বিবেকানন্দের সাম্যবোধ আরো একধাপ এগিয়ে গেছে শ্রমজীবী জনতার স্বার্থে। তিনি শ্রমজীবী মানুষদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন: 'হে ভারতের শ্রমজীবী, তোমায় প্রণাম।' শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রমজীবিগণকে আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন: 'উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই/উপস্থিত যুগান্তর/ঘুমাবার আর বেলা নাই/উঠ জাগো ডাকিতেছি তাই'।[৫] এর বেশী শ্রমিক কল্যাণের বাস্তব প্রকাশ সেদিন আর লক্ষিত হয় নি।

ভারতে শ্রমকল্যাণের ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের কোন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেনি। ভারতে শ্রমিক-মঙ্গলের প্রথম যুগের যাবতীয় প্রচেষ্টার দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যেতে পারে ভারতে শ্রমিক সংগঠনের মুখ্য ভূমিকা ছিল শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই। ইনি শ্রমিক কল্যাণের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বিলাতের সমাজসেবিকা মিস্ মেরী কার্পেণ্টারের সান্নিধ্যে এসে। মেরী কার্পেণ্টার নিজে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে ভারতের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি স্বাভাবিকভাবে তাঁর মমত্বের সৃষ্টি হয়। তিনি এ দেশের শোষিত-নিপীড়িত শ্রেণীর মঙ্গল কামনায় গুরুত্ব দিতে পেরেছিলেন আরো একটি কারণে; যেহেতু 'তিনি বিলাতে 'Working Mens Club'-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে

জড়িত ছিলেন। শশীপদ কেবল মিস্ কার্পেণ্টারের সংস্পর্শে এসেই ভারতে শ্রমজীবীদের স্বার্থ রক্ষার কথা ভেবেছিলেন তা নয়, তিনি নিজে ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় স্বচক্ষে দেখেছিলেন ইংলণ্ডেও শ্রমিক অসন্তোষ কি ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তিনি এ-দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণকে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই আগ্রহের কথা জেনেছিলেন মিস কার্পেণ্টার। ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর দৈন্যের কথা ১৮৭১ সালে ১৭শে এপ্রিলে লণ্ডনে গিয়ে শশীপদবাবু বিভিন্ন সভা সমিতিতে ব্যক্ত করেন[৬] এবং তাদের প্রতি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের বিমাতৃসুলভ আচরণকে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন। বৃটিশরাজ ভারতীয় শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কোন বৈধ আইন করেনি। মালিকপক্ষও এ-বিষয়ে উদাসীন ছিল। কিন্তু মালিকের পক্ষে উদাসীন থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ মালিকের পুঁজি বৃদ্ধি যেখানে লক্ষ্য, সেখানে শ্রমিক-কল্যাণের কথা ভাবা অবাস্তর। এর ফলে মালিকের জোর জুলুম ও অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরকার কোন ভূমিকাই গ্রহণ করে নি। বরং শ্রমিক-শ্রেণীকে পেষণ করার প্রচলিত অভ্যাসটিকে টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে।

কি অপূর্ব ন্যায়বোধ। ইংলণ্ডের শ্রমিকদের জন্যে যেখানে বিভিন্ন নিরাপদ আইন চালু হয়েছে, সেখানে ভারতীয় শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সে-ধরণের কোন আইনই প্রবর্তিত করার কথা ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখেননি। এ তথ্য জেনেছিলেন সমাজসেবী মেরী কার্পেণ্টার। এ দেশের শ্রমিকশ্রেণী বৃটিশ শাসনের কোন সুবিধা পায়নি; বরং তার কুফলগুলিই ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর মঙ্গল কামনাই নয়, শশীপদ সেই সঙ্গে শ্রমিকদের স্বাভাবিক ভাবে জীবন-যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় শর্তগুলির কথাও চিন্তা করতে পেরেছিলেন—মেরী কার্পেণ্টারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। এই প্রভাবের কথা মিস্ কার্পেণ্টারকে লেখা শশীপদের এক চিঠি থেকে জানা যায়: I used to look to that Church [Brahomo Samaj] only as the torch from which light would gradually fall on all sides of Barahanagar and its adjoining places ;····· but your visit has opened out new paths to my view, new fields of action. I had scarcely time to do anything practical good for the great mass of the people, and had scarcely

thought of so doing. Indeed I had opened a Girls' school for educating girls of the respectable community···I have even succeeded to start a night school for the working people of the factory, but all these are nothing to compare with the work we have in view the Temperance Society of this place so long tried to only reclaim gentlemen from the habit of drinking strong liquors. Now we should try to go into the circles of the working people, people who are in this country held as low, and as not important members of the society'.[১]

মিস্ কার্পেন্টারের প্রেরণাতেই নয়, অন্তরের প্রেরণাও শশীপদর কম ছিল না। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভারতীয় শ্রম-আইনের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধাগত ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়ে 'হাফ টাইমের' কথা সর্বপ্রথম দাবি করে-ছিলেন। তিনি কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে একটানা কাজের মধ্যে দু-থেকে তিন ঘণ্টার মতো অবকাশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি শ্রমিক মঙ্গলের দায়িত্ব কেবল মৌখিক ভাবে পালনের চেষ্টা করেননি, ব্যক্তিগত উদ্যোগে শ্রমিকদের উপর যাবতীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধের ভূমিকাও নিয়েছিলেন। শ্রমিকদের উপর পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এ-ক্ষেত্রে তাঁর সকল ভূমিকা স্মরণীয়।

শশীবাবুর এই সব কর্মকাণ্ডের দৃষ্টান্ত কম নয়। তিনি শ্রমিক শ্রেণীকে সামাজিক দুর্নীতি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে ব্যক্তিগত ভাবে বহু কর্মসূচী গ্রহণ করে ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরই অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণাতে, শ্রমিক স্বার্থে ১৮৭০ সালের আগষ্ট মাসের ২১ তারিখে গঠিত হয়েছিল 'শ্রমজীবী সংঘ' [Working Men's Club], যা ভারতের প্রথম শ্রমিক সংগঠন। ভারতের ধর্মঘটের প্রথম যুগে 'শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র··· সংগঠনের ভিতর দিয়ে তিনি ধর্মঘট পালনের কথা চিন্তা করতে পারেন নি। তিনি শ্রমিক মালিক সম্পর্কে ফাটল ধরানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। গোপনে কিংবা কৌশলগত উপায়ে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টাও করেননি। খোলাখুলি এবং প্রকাশ্যেই শ্রমিকদের যাবতীয়

সমস্যার সমাধান করতে বেশী পছন্দ করতেন। আন্তর্জাতিক শ্রম-আন্দোলনের মৌল কৌশলগুলি তাঁর চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায় নি। তিনি ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনাকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়ার ফলে, ভারতের শ্রমিক সংগঠনের চেহারাটি তেমন বলিষ্ঠ আকার ধারণ করতে পারেনি। সেজন্যেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'শ্রমজীবী সংঘ' ধর্মঘট আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। 'শ্রমজীবী সংঘের' কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গে তাঁর পুত্র রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে শ্রমজীবী সংঘ 'exercised a healthy influence on the workers with a view of ending the use of the Strike weapon···Sasipada advised the workers to look to the interests of their employers and at the same time to present their grievances in a legitimate manner.'[৮]

যেখানে শ্রমিক সংগঠন এবং ধর্মঘট শ্রমিক শ্রেণীর জঙ্গীমনোভাবকে জাগ্রত করার এবং কমিউনিজমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার পাঠশালা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে, যেখানে যথার্থ শ্রমিক সংগঠন ও ধর্মঘটের ক্রিয়া-কাণ্ডগুলির ভিতর দিয়ে সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী, শ্রেণীগত ভাবে ভাবীকালের সর্বহারার বিপ্লবের নেতৃত্বের উপযোগী হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর ভিতরে এ শিক্ষার গুরুত্ব সর্বত্রই অনুপস্থিত ছিল। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী চেতনার প্রস্তুতি ছিল না বললেই চলে। শশীপদবাবু শ্রমিক-মালিক অসন্তোষের মধ্যে না গিয়ে, উভয় পক্ষের সুবিধা এবং অভাব-অভিযোগগুলি খণ্ডন করে 'ধর্মঘটের' মতো মারাত্মক সংগ্রামকে এড়িয়ে গেছেন দুই পক্ষের কল্যাণের দিকগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে। তাঁর এমন ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় লণ্ডনে বক্তৃতা দেওয়ার সময়। তিনি বলেছিলেন, 'I have been trying to teach them [the working class] that labour is honourable, not to bring disorder and confusion among them, but to bring class and class in sympathy with each other'.[৯] এঁর শ্রমিক মঙ্গলের যাবতীয় প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে একথাটিই সত্য যে, 'শশীপদ সব সময়েই শ্রমিকদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও আনুগত্যের শিক্ষা দিয়েছেন'।[১০]

শশীপদবাবু শ্রমিকদের কল্যাণে বিশেষ শিক্ষার দ্বারা তাদের ব্যক্তি সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়ে ভারতের শ্রমিকদের জন্যে একটি মুখপত্র

প্রকাশ করে শ্রমজীবীশ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষা ও চারিত্রিক উন্নতির বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন।

শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও পরিচালিত সচিত্র মুখপত্রটি ভারতের শ্রমজীবী মানুষের প্রথম মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৮৭৪ সাল নাগাদ। পত্রিকাটির নাম ছিল 'ভারত শ্রমজীবী'। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী কোন আদর্শ কাগজটির ছিল না কিংবা কোন গোঁজামিলের আশ্রয়ও সম্পাদক নেননি। শিক্ষার বিস্তার এবং শ্রমজীবীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল 'ভারত শ্রমজীবী'র অন্যতম উদ্দেশ্যে: 'শ্রমজীবীদের মধ্যে সম্পর্ক, মালিকের এবং সমাজের প্রতি তাদের কি রকম মনোভাব হওয়া উচিত সে সম্পর্কে নির্দেশ থাকবে'।[১১] 'ভারত শ্রমজীবী' বেশ কয়েক বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশ হয়েছিল। এমন কি 'ভারত শ্রমজীবী' কেবল শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ-সংরক্ষণের কাজেই ব্রতী ছিল না, পত্রিকাটি গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষদের মধ্যেও সাড়া জাগাতে পেরেছিল। সুদূর গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের কাছে কাগজটি নিয়মিত যেত বলে জানা যায়।

শশীবাবুর কর্মময় জীবনের সব দিকগুলো বিচার করে দেখলে দেখা যাবে তিনি ছিলেন মনের দিক থেকে একজন প্রকৃত সমাজসেবী। সমাজসেবার ভিতর দিয়েই তিনি শ্রমিক শ্রেণীর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে গঠনমূলক চিন্তা করতেন। তিনি বরানগর অঞ্চলে শ্রমজীবী জনসাধারণের ভিতরে যে কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন, তার মধ্যে হয়তো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রকাশ ছিল না, এমনকি তাঁর সংগঠনে কোন শ্রম-আন্দোলনের কৌশলও ছিল না, এও স্বীকার করতে আমরা বাধ্য যে, পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমিকের প্রতিরোধ, আন্দোলন, কিংবা ধর্মঘটের মহান শিক্ষাও তাঁর নেতৃত্বে অনুপস্থিত ছিল। জনৈক গবেষক শশীপদর শ্রমিক আন্দোলনে নিষ্ক্রিয় ঐতিহ্য বহনের সাক্ষ্য লক্ষ্য করেছেন।[১২]

কিন্তু একথা সর্বাংশে মানা যায় না। শশীপদর শ্রমিক আন্দোলনে হয়তো আন্তর্জাতিক চিন্তা-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি, কিন্তু তাকে নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। কারণ, ভারতে শিল্প-শ্রমিক সৃষ্টির প্রথমযুগে শ্রমিকের কোন নিজস্ব সংগঠনই ছিল না, আন্দোলন তো দূরের কথা। সংগঠন বাদ দিয়ে বৃহত্তর কোন আন্দোলনের কথা ভাবাই অবাস্তর। তাই যে কোন

ধর্মঘটের আগে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। সেই সংগঠন তৈরির কাজেই শশীপদর আজীবনকাল কেটেছে। তিনি নানাবিধ উদ্যোগের মধ্য দিয়ে ভারতের শ্রমিক সংঠনের প্রথম যুগে, ভারতের শ্রমজীবীদের সংগঠিত করতে পেরেছিলেন। অবশ্য এরই পাশে পাশে শ্রমিকদের ধর্মচেতনাকে সম্প্রসারিত করায়, তা যে গণআন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে, সে-বিষয়টি তিনি পর্যালোচনা করে দেখার অবকাশ পাননি। তবুও এ কথা ভুললে চলবে না, শশীপদই সেকালের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি শ্রমিকদের যথার্থ শিক্ষা দিয়ে, সত্য ও ধর্মের পথে পরিচালিত করে, মদ্যপানের মতো মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে শ্রমিকদের বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরই আপ্রাণ চেষ্টায় চটকলের তৎকালীন শ্রমিকরা দক্ষ কারিগরে রূপান্তরিত হতে পেরেছিলেন এবং নিজেদের অবস্থা ও কাজ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার ফলে, নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। শশীপদের শ্রমজীবী সংগঠন ও শ্রম আন্দোলনের প্রত্যক্ষ পরিণতিই পরবর্তী কালের সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের উপর 'ভারত শ্রমজীবী সংঘ' ও 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

বাঙলাদেশে আধুনিক শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পথিকৃৎদের এক বৃহৎ অংশ ব্রাহ্ম ছিলেন। তার সঙ্গে ১৮৭১-৭৪-এ শশীপদ ও তাঁর বন্ধুবর্গের সম্পর্ককে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এই অর্থেই শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত শ্রমজীবী সংঘ' ও 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকা আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

খ.

শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট :

ইতিহাসের পুরানো শিক্ষা ও পূর্ব ঐতিহ্যের ভেতর দিয়েই ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর যাত্রা সূচিত হয় এক নতুন অধ্যায়ের দিকে। যে অধ্যায়টি মুক্তির ও অধিকার অর্জনের, তা শুরু হয়, ১৮৬২ সালে। ১৮৬২ সালটি ভারতীয় শ্রমিকের গৌরবময় অধ্যায়ের বছর হিসাবে চিহ্নিত। ভারতীয় শ্রমিক এই

বছরেই এক নতুন ইতিহাস রচনা করে আট ঘণ্টা কাজের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে, ভারতীয় শ্রমিকদের স্বাধিকার অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসাবে তাই ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দ যথার্থই স্মরণীয়। ভারতের ধর্মঘটের ইতিহাসে আট ঘণ্টা কাজের দাবীকে সামনে রেখে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্তি পথের সন্ধান ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের দিকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। ভারতীয় শ্রমিকদের ধর্মঘট পালন—এক নতুন শক্তির উন্মেষ ঘটায়। যে শক্তির উন্মেষে ভারতের বিপুল জনশক্তির ভিতরে নবজাগরণের আর একটি দিক পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

আমরা জানি যে, বৃটিশ অর্থনীতিকে পুষ্ট করে তুলতেও এদেশের শিল্প-বিকাশকে উৎসাহ দেওয়া হয় নানা ভাবে। বৃটিশ স্বার্থেই এ দেশের রেল-পথ নির্মিত হয়েছিল। ভারতের জনগণের স্বার্থে রেলের চাকা ঘোরেনি। রেলপথ কয়লা খনি অঞ্চলে সম্প্রসারিত বিশ মাইল থেকে তিনশো মাইলে পরিণত হওয়ার ঘটনাই প্রমাণ করে যে রেল বৃটিশ পুঁজির স্বার্থেই কাজ করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই এ দেশের আধুনিক শিল্প বিকাশে রেলপথ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই রেল ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা খুব একটা নগণ্য বলা যায় না। সেকালে রেলপথগুলির মালিকরাও ছিলেন বিদেশী। তাঁরা ভারতে রেলপথ নির্মাণের জন্য বৃটিশ কোম্পানীর অর্থনৈতিক সহযোগিতাও পেয়েছেন। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা অর্জন সত্ত্বেও বিদেশী মালিক মুনাফার দিকটিতেই বেশী করে ঝুঁকেছে—সুষ্ঠু পরিচালনার দিকে তাদের তেমন নজর ছিল না। শ্রমিকদের ভাল-মন্দের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপও তাদের ছিল না। শ্রমিক স্বার্থে সুষ্ঠু ব্যবস্থার চেয়ে মুনাফাই যেখানে মূল লক্ষ্য, সেখানে অনিবার্য-ভাবে শ্রম ও পুঁজির লড়াই লাগবেই। ফলেই রেলের চাকা বার বার বন্ধ হয়েছে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ-ধর্মঘট ও আন্দোলনের ভিতর দিয়েই।

১৮৫৪ সালে রেল চালু হয়েছিল ভারতে, তার আট বছর পরে অর্থাৎ ১৮৬২ সালে রেলের চাকা প্রথম বন্ধ হয়েছিল। অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণী অপেক্ষা রেলের শ্রমিকরাই চেতনার দিক থেকে দুর্বল ছিল। রেলের মালিকানাধীন কোম্পানীগুলির প্রচেষ্টা ছিল ভারতীয় শ্রমিকদের 'বিভেদমূলক ব্যবস্থার' মধ্যে রাখা। গুরুত্বপূর্ণ পদ ও কাজগুলির ক্ষেত্রে ইংরেজ ও

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরাই ছিলেন সংখ্যায় অধিক। আর নিম্নস্তরের কাজ-কর্মের জন্য ভারতীয় ঠিকা কর্মচারীদের নিয়োগ করা হোত। ফলে, ভারতীয় ও বিদেশীয়দের মধ্যে একটা বৈষম্য সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের মধ্যে কোন ভ্রাতৃত্ববোধ বা যোগাযোগ না থাকার ফলে শ্রমিকদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। ভারতীয় শ্রমিকদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে আরো একটি বড় রকমের বাধা ছিল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। সামাজিক অনুশাসনে ভারতীয়দের কাছে জাত পাতের বিষয়টিও ছিল একটি জরুরী সমস্যা। যে সমস্যাটি শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে বহুকাল। রেলের প্রথম যুগে এত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, ভারতীয় রেল-শ্রমিকের অভ্যুত্থান ঘটে হঠাৎই। পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের লড়াই যেন এখান থেকেই শুরু, অর্থাৎ ১৮৬২ সালের মে মাসে। হাওড়ার রেলওয়ের বারশো শ্রমিক কর্মচারীর সংগ্রাম শুরু হয় আট ঘণ্টা কাজের দাবীতে। এই ধর্মঘটে সেকালে সকলেই সচকিত হয়ে উঠেছিলেন। সংবাদপত্রেও রেল শ্রমিকদের এ-ধরণের ধর্মঘট সম্পর্কে লেখা হয় : 'সম্প্রতি হাবড়ায় রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রায় ১২০০ মজুর কর্মত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বলে লোকোমোটিভ [গাড়ি] ডিপার্টমেন্টের মজুরেরা প্রত্যহ আট ঘণ্টা কাজ করে। কিন্তু তাহারদিগকে ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। কয়েক দিবসাবধি কার্যস্থগিত রহিয়াছে।'[১৩] সংবাদপত্রটি কেবল সংবাদের জন্যেই সংবাদ পরিবেষণ করেন নি, রেলকর্মীদের ন্যায্য আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপনে লেখেন, 'রেলওয়ে কোম্পানি মজুরদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করুন নচেৎ লোক পাইবেন না'।[১৪] শ্রমিকদের দাবীর প্রতি সংবাদপত্রের নৈতিক সমর্থন, ভারতীয় শ্রমিকদের এই আন্দোলনে যে প্রেরণা যুগিয়েছিল তা পরবর্তী ক্ষেত্রে মেহনতি মানুষের লড়াইয়ের উৎসাহকে বাড়াতে সাহায্য করেছে।

ভারতে কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবী রেলওয়ে শ্রমিকরাই প্রথম করেন। যা ধর্মঘটের ইতিহাসে 'ভারতের সামাজিক জীবনের এক সুস্থ ও সহজাত প্রকৃতির মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর...রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন ঘটনা রূপে বিধৃত'।[১৫] বিশ্বে যে ঘটনা তখনও আত্মপ্রকাশ করেনি, তার অনেক আগে এমন একটি ঘটনার সৃষ্টি, শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক জাগরণে কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল। এখান থেকেই ভারতীয় শ্রমিকের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের

সূচনা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম দিকে যা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, ভারতের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হওয়ার ফলে সমাজতন্ত্রের প্রশ্নে, ভারতীয় রেলশ্রমিকের বন্ধন মুক্তির সংগ্রাম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৮৭১ সালে বিশ্বের কোন দেশেই প্রলেতারিয়েতের কোন রাজনৈতিক গণসংগঠনই ছিল না, ট্রেড ইউনিয়ন তো দূরের কথা। ভারতের ক্ষেত্রে তো কোন কথাই নেই। ন্যূনতম কর্মসূচী কিংবা গঠনমূলক শিক্ষণীয় ধারণাও তেমন ছিল না। কেবল যখন যেমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতেই ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য গড়ে উঠেছে, যা ভারতীয় শ্রমিকের পক্ষে আন্দোলনের অন্যতম ভিত্তি হিসাবেও কাজ করেছে।

১৮৬২ সালে হাওড়া রেল শ্রমিকরাই কাজের ঘণ্টা হ্রাসের প্রশ্নে যে ধর্মঘটের সূচনা করে, তারই পথ ধরে ঐ বছরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের অডিট বিভাগের কেরাণীদের ধর্মঘট হয়। এখানে কাজের ঘণ্টার আন্দোলন ছিল না। অডিট বিভাগের বড় সাহেব বাঙালী কেরাণীদের অপমানিত করলে কেরাণীরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দিনের পর দিন কাজে অনুপস্থিত থেকে ঘটনাটির তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এই প্রতিবাদ কেবল ধর্মঘটের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ঘটনাটির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অফিসের সামনে নিয়মিত ধর্ণা দেওয়া, বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে আন্দোলনটি জোরদার হয়ে ওঠে। কর্মচারীদের বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের ফলে বড় সাহেব কর্মীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ঘটনাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটায়। এই ধর্মঘট হাওড়া রেল শ্রমিকদের গৌরবজনক ভূমিকারই ফল।

১৮৬২-তে ভারতের শ্রমিকেরা অধিকার অর্জন ও মুক্তির জন্যে যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, সেই সংগ্রামের সূত্র ধরে অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষেরা ধর্মঘট পালন করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন সমান অধিকার আদায়ের জন্যে। ভারতীয় শ্রমিকদের ধর্মঘটগুলি স্বল্পকালীন ও সর্বক্ষেত্রে পরাজয় অনিবার্য হওয়া সত্ত্বেও, বিভিন্ন শিল্প-সংস্থায় ধর্মঘট পালনের প্রবণতা কম ছিল না। British Parliamentary Papers [xxxvi, vol. ll. part V 1892] থেকে তৎকালীন ধর্মঘটগুলির উৎস জানা যেতে পারে। এ ছাড়াও ভারতে অনুষ্ঠিত খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ধর্মঘটের ঘটনাগুলির বিবরণও সংবাদপত্রের পাতায় ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে।

এই সময়ের ভারতীয় শ্রমিকদের বিশিষ্ট ধর্মঘটগুলির মধ্যে ১৮৭৩ সালে বোম্বাইতে প্রেস কর্মচারীদের ধর্মঘটটি উল্লেখের দাবী রাখে। এ ধর্মঘটকে ব্যর্থ করার জন্যে কর্তৃপক্ষ মাদ্রাজ থেকে পুলিশ নিয়ে এসে দমন-পীড়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। দালাল দিয়ে ধর্মঘট ভাঙার দৃষ্টান্ত কেবল একালেই নয়, সেকালেও প্রচলিত ছিল। ১৮৭৩-এ আমেদাবাদে ইটভাঁটি ও দর্জিদের ধর্মঘট ভারতীয় শ্রমজীবী মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়। এ ছাড়া ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই-এর তিন সহস্রাধিক নরসুন্দরের ধর্মঘট, মাদ্রাজে মাংস বিক্রেতাদের ধর্মঘট, কলকাতার ঘোড়ার গাড়ীর ধর্মঘট শ্রমজীবী মানুষদের নবচেতনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না কি?

১৮৭৭ সালে নাগপুর এম্প্রেস মিলের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সংক্রান্ত ধর্মঘট, শিল্প শ্রমিকের বৃহত্তম ধর্মঘট আন্দোলনের নির্দশন। এই সময়কার ধর্মঘটগুলির পুঞ্জি অনুসরণে জানা যায় যে, ১৮৮২ সাল থেকে শুরু করে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত এক বোম্বাই ও মাদ্রাজেই অন্ততঃ তিরিশটিরও বেশী ধর্মঘট পালিত হয়েছে। কোন কোন শিল্প-সংস্থায় দু-বার পর্যন্ত ধর্মঘটের পোষ্টার দেওয়াল জুড়ে দেখা গেছে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় যে ধরণের দ্রুত শিল্পায়ন ঘটে ছিল, ঠিক সেভাবে উত্তর ভারতে ঘটেনি। ফলে শ্রমিক ধর্মঘটের মূল কেন্দ্রও তাই গড়ে উঠে ছিল ভারতের তিনটি প্রধান শহরকে ঘিরেই। এই তিনটি শহরে যত দ্রুত শিল্পায়ন ঘটেছে, শ্রমিকদের সংহতি যত জোরদার হয়ে উঠেছে, ধর্মঘটের প্রবণতাও তত বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ের ধর্মঘটে শ্রমিকের জয় হয়তো অনিশ্চিত ছিল ; সেই সঙ্গে শ্রমিক উৎপীড়নের ব্যবস্থা হিসাবে শাস্তি, জেল, জরিমানা এমনকি বেতন কাটা ও বেতন না দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। এসবের বিরুদ্ধে তো বটেই, একদিনের ছুটি, আট ঘণ্টা কাজ, কারখানা আইন ও মজুরি বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে ১৮৬২ সাল থেকে শ্রমিকেরা আন্দোলন কম করেননি, এবং এই আন্দোলনের প্রকৃত কারণগুলি মূলতঃ অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রেই পরিচালিত হয়েছে। একটি সারণীর মাধ্যমে ধর্মঘটগুলির প্রকৃত কারণ কি ছিল তা দেখা যেতে পারে :

সাল	প্রতিষ্ঠান	ধর্মঘটের কারণ	দিন সংখ্যা
১৮৬২	হাওড়া রেল ষ্টেশন	৮ ঘণ্টা কাজের জন্য	×
১৮৬২	ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে	কেরাণীরা অপমানিত হওয়ায়	১

১৮৭৩	বোম্বাই সরকারী প্রেস	×	×
১৮৭৩	আমেদাবাদ ইটশিল্প	×	×
১৮৭৭	নাগপুর এম্‌প্রেস মিল	মজুরি সংক্রান্ত	×
১৮৮১	ঘুস্‌রী কটন মিলস্‌	মজুরি হ্রাস	১০
১৮৮১	ওয়ার্ধা হিংগণঘাট মিল	শ্রম বিরোধ	×
১৮৮১	মাদ্রাজ সাদার্ণ ইণ্ডিয়া স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোঃ লিঃ	×	×
১৮৮১	কুর্লা স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিল	×	×
১৮৮১	বোম্বাই নাওরোসজী ওয়াদিয়া এণ্ড সন্স	মজুরি হ্রাস	×
১৮৮২	সুরাট গুলামবাবা স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিল	ম্যানেজারের সঙ্গে বিরোধ	২
১৮৮২	ঐ	ঐ	৬

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম যুগের ধর্মঘটগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়েই এগিয়েছে। বলাই বাহুল্য, এই সব ধর্মঘট শ্রমিক জাগরণের প্রথম যুগে শ্রমিকদের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের ধারণার জন্ম দেয়। পরবর্তীকালে যার সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনে সমাজতন্ত্রের প্রশ্নটি যুক্ত হয়। তাই ভারতে ধর্মঘটকে বাদ দিয়ে কি রাজনৈতিক, কি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন সম্পূর্ণ হতে পারেনি। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় আন্দোলনের প্রশ্নে, সুসংহত অগ্রণীবাহিনীরই পরিচয় বহন করেছে।

গ.

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের প্রেরণা :

'যা কিছু শ্রমিকদের ক্ষতি করে আমেরিকার প্রতি তা বিশ্বাসঘাতকতা।... ...শ্রমিকরা যখন ইচ্ছে তখনই ধর্মঘট করতে পারে, এমন একটা ব্যবস্থা চালু থাকতে দেখে আমি খুশি।'[১৬] একদা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন একথা বলেছিলেন আমেরিকার শ্রমিকদের প্রতি। কিন্তু আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির মন্তব্যের

বিপরীত দৃষ্টান্তই মেলে। কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবীতে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় উনিশ শতকের প্রথমদিকে জোরদার আন্দোলন শুরু হতে থাকে। যে আন্দোলনের মূল চরিত্রই ছিল ধর্মঘটকেন্দ্রিক। ধর্মঘট ও আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমেরিকার শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা পায়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের মুখ্য দাবিই ছিল কাজের ঘণ্টা হ্রাসের বিষয়ে। ১৮২০ সাল থেকে গোটা বিশ্বেই এই দাবী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন দিক থেকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সেকালের শিল্পে শ্রমিকের কাজের ঘণ্টার নির্দিষ্ট কোন সময় ছিল না। ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা কাজ ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। কখনো কখনো এর বেশীও কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে শ্রমিকদের। পৃথিবীর সব দেশেই শ্রমিকদের এমন নিযাতন সহ্য করার ঘটনা বিরল ছিল না। 'ওয়ার্কিং-ম্যানস্ এড্‌ভোকেট' পত্রিকায় শ্রমিক নির্যাতনের বহু দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। ঐ পত্রিকারই একটি প্রতিবেদনে জানা যায় যে, 'মিশর দেশের ক্রীতদাস প্রথার চেয়েও দুঃসহ অবস্থার মধ্যে বছরের পর বছর দিন কাটায় রুটি কারখানার কারিগরেরা; ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮।২০ ঘণ্টার খাটুনি ছিল এই কারখানায় স্বাভাবিক। জুতা শ্রমিকদেরও একই অবস্থা।'[১৭] এইসব শিল্প-শ্রমিকরা তাঁদের কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবীতে ও স্বাধিকার রক্ষার লড়াই এ দিনের পর দিন সংগ্রাম চালাতে বাধ্য হয়েছেন। এই সংগ্রামগুলির মূল কৌশলই ছিল শিল্পে অচল অবস্থার সৃষ্টি করা। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর জয় সহজসাধ্য হয়ে উঠেনি। শ্রমিকদের খণ্ড-বিচ্ছিন্ন গণ-আন্দোলনকে সহজেই দমন করেছেন শিল্পপতি কিংবা শিল্পপতিদের লেজুড় সরকারী ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী। দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে সেকালে বহু বাধা ছিল। নিজস্ব 'রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্যে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রমিককেরা বিক্ষোভ, মিছিল, জনসভা, ধর্মঘট এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের' মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করেছে। শ্রমিকদের এ-সংগ্রাম ছিল দীর্ঘকালীন। শ্রমিকদের ন্যায্য আন্দোলনকে বানচাল করার জন্যে সরকার পক্ষ কম কৌশল করেনি। এর ফলে তাঁদের বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমন কতকগুলো অবস্থার কথা কার্ল মার্কসের লেখার মধ্যে মেলে: 'ধর্মঘট বা লক-আউটের ক্ষেত্রে শ্রমিকরা যে সব উপায়ের আশ্রয় নিতে পারত, পার্লামেণ্ট ও চালাকি

মারফত তাকে সমস্ত নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ আইনগুলো থেকে সরিয়ে এনে ন্যস্ত করা হয়েছে আলাদা দণ্ডবিধির ওপর, যার ব্যাখ্যার ভার পড়বে শান্তিরক্ষক বিচারক হিসাবে খোদ মনিবদের ওপরেই।'[১৮]এখানেই কৌশলের শেষ নয়। উপরোক্ত বেইমানিতে তৃপ্ত না থেকে "আগেকার 'ষড়যন্ত্র বিরোধী আইন' কবর থেকে তুলে এনে শ্রমিকদের জোট বাঁধার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করার অনুমতি দেয় শাসকশ্রেণীর সেবায় তৎপর ইংরেজ বিচারকদের। দেখা যাচ্ছে, ইংরেজ পার্লামেণ্ট নিজে ৫০০ বছর ধরে নির্লজ্জ স্বার্থপরতায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের একটা কায়েমী ট্রেড-ইউনিয়নের পদ অধিকার করে থাকার পরে ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী আইনগুলি খারিজ করে কেবল তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও জনগণের চাপে।"[১৯]

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে পরিচালিত হওয়ার ঘটনা ইতিহাস হয়ে আছে। উনিশ শতকের শ্রমিক আন্দোলনগুলি পুঁজিপতিদের তেমন কোন ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারেনি। তবে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনেরও শেষ ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ধর্মঘট-আন্দোলন সফলতা অর্জন করলেও, মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্যায় জুলুমে শ্রমিকেরা পদে পদে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েছেন। বিশেষ করে আমেরিকার ঐতিহাসিক মে দিবসের প্রাক্কালে পুঁজিপতিদের দারুণ দম্ভ ছিল। আমেরিকার ডাক সাইটের রেলপথ-মালিক জে. গোল্ড সে সময়ে দম্ভের সঙ্গে বলতে পেরেছিল: 'আমি শ্রমিকশ্রেণীর অর্ধেককে ভাড়া করতে পারি বাকি অর্ধেককে খুন করার জন্য।'[২০] সেকালে এ ধরণের একচেটিয়া পুঁজিপতির অভাব ছিল না। হেনরি ফোর্ড, রক ফেলার ইত্যাদি রাঘব বোয়ালদের সেটাই ছিল জন্মলগ্নের কোষ্ঠীপত্র। এমন অপকর্ম ছিল না, যা এইসব মুনাফা শিকারী অর্থ পিশাচেরা করতে দ্বিধা করতো। এমন কি 'পিং কার্টন এজেন্সি' নামে একটি কোম্পানী খোলা হয়েছিল,—যাদের কাজ ছিল ধর্মঘট-ভাঙা ও ধর্মঘটীদের খুন করা। যেখানেই ধর্মঘট, সেখানেই শ্রমিকদের খুন জখমের জন্য ডাক পড়তো তাদের। কিন্তু এত সত্ত্বেও শ্রমিক আন্দোলনকে দমাতে পারেনি আমেরিকার শাসক সম্প্রদায়। ১৮৬১ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কাল থেকেই শ্রমিক আন্দোলনগুলি জঙ্গী হয়ে উঠে। এ-সময়েই শিল্পপতিদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে শুরু হয়

ব্যাপক আন্দোলনের কর্মযজ্ঞ।

পুঁজিপতির সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতার একটা গাঁটছড়া চিরকালই বাঁধা থাকতে দেখা যায়। ফলে ধর্মঘট ভাঙা ও শ্রমিক আন্দোলনগুলি নস্যাৎ করার মতো সন্ত্রাস সৃষ্টিতে রাষ্ট্রক্ষমতার একটা ব্যবহারিক দিক আমেরিকাতে বর্তমান ছিল। পুলিশবাহিনী দিয়ে শ্রমিক দমনের চেষ্টা কম করা হয় নি। এমন কি সরকারের পেটোয়া সংবাদপত্রগুলিও শ্রমিক-স্বার্থের পরিপন্থী মন্তব্য প্রকাশ করে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনগুলোকে কার্যতঃ ব্যর্থ করার একটা অপচেষ্টা করেছে। আমেরিকার একটি সংবাদপত্রের মন্তব্যে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা সেদিন কতখানি ন্যাক্কারজনক ছিল : 'এইসব পাশবিক জীবগুলি জোর জবরদস্তি ছাড়া আর কোন যুক্তি বোঝে না। তাই সেই শক্তি সরকারের তরফে এমনভাবে প্রয়োগ করার প্রয়োজন যাতে তাদের ভাগ্য দেখে সাবধান হবে অন্যান্য ধর্মঘটীরা।'[২১] কিন্তু এতসব সত্ত্বেও শ্রমিকদের সংগ্রামী মনোবলে চিড় খাওয়াতে পারেনি, দমন করা তো দূরের কথা। সরকার যত কঠোর হয়েছেন, শ্রমিকেরাও তেমনি সরকার বিরোধী কাজে বেশী উৎসাহিত হয়েছেন এবং সুসংহত বাহিনী হিসাবে আরো শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ হয়েছেন। যার সফল দৃষ্টান্ত ১৮৬৬ সালের ২০শে আগষ্ট ৬০ টি ট্রেড ইউনিয়নের যুক্ত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বাল্টিমোরে গঠিত হয় 'National Labour Union'; যা আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনকে জোরদার করে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।

আমেরিকার শ্রমিক সমাজই বিশ্বে প্রথম আট ঘণ্টা কাজের দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং 'National Labour Union'-ই প্রথম, বিশ্বের যে কোন দেশে আট ঘণ্টা কাজের দাবীতে ধর্মঘট পালিত হলে, তাকে সমর্থন করেছে। অশুভ শক্তি ও তাদের অনুগামীরা ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টায় তৎপর হলে, তাদের হটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে 'National Labour Union' এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করায়, দেশ থেকে দেশান্তরের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ চেতনার ক্রমসম্প্রসারণ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এদের কর্ম তৎপরতায় ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ফলে গোটা দুনিয়ার মজুর আট ঘণ্টার কাজের দাবীকে সামনে নিয়ে আসে। সেই সঙ্গে একের পর এক ধর্মঘটগুলি সর্বত্র ঐতিহাসিক পরিস্থিতি গড়ে তোলে এবং ধর্মঘটের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বিস্তৃত হয়। ১৮৭৫ সালে ১০ জন জঙ্গী ধর্মঘটী শ্রমিকের ফাঁসি আন্তর্জাতিক শ্রমিক

আন্দোলনকে আরো দৃঢ়তা দান করে। ১৮৭৭ সালের ইস্পাত শ্রমিকদের ধর্মঘট পুঁজিপতি ও শিল্প মালিকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করে। এই সময়ে, ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ৫০০ ধর্মঘট ও তালাবন্ধের ঘটনা ঘটে আর সে এগুলোতে গড়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক যোগ দেন। ১৮৮৫ সালে ঐ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭০০ এবং সেগুলিতে যোগদানকারী শ্রমিকদের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার। ১৮৮৬ সালে ধর্মঘট ও তালাবন্ধের সংখ্যা ১৮৮৫ সালের দ্বিগুণ, অর্থাৎ ১৫৭২; যোগদানকারী শ্রমিকের সংখ্যাও আনুপাতিক হারে বেড়ে দাঁড়ায় ৬ লক্ষ। ধর্মঘটের কেন্দ্র ছিল শিকাগো, তবে নিউ ইয়র্ক, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, মিলওয়াকী, সিনসিনাটি, সেন্টলুই, পিটসবুর্গ ইত্যাদি শহরেও তা ছড়িয়ে পড়ে। এইসব আন্দোলনগুলি এক নতুন অধ্যায়ের দিকে মোড় নিতে শুরু করে। যা এঙ্গেলস-এর ভাষায়—শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীকে দৈনন্দিন রাজনৈতিক ময়দানে বেশি করে টেনে আনতে বাধ্য করেছে। তখন কোথাও কোথাও ধর্মঘট এক সপ্তাহ, একমাস বা কয়েক মাস ধরে চলেছে। যদিও বেশির ভাগ আন্দোলন ছিল আর্থিক দাবি আদায়ের জন্য। আর এই অর্থনৈতিক দাবী আদায়ের আন্দোলনের সঙ্গে কাজের ঘণ্টা কমানোর আন্দোলন যুক্ত হতেই 'নিউইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিস্‌কো পর্যন্ত গোটা শিল্পাঞ্চলে ধর্মঘটের পর ধর্মঘটের জোয়ার আসে।' এই ধর্মঘটের প্রেরণা আন্তর্জাতিক সমর্থনও পেয়েছিল। কিন্তু সহজে শ্রমিকশ্রেণী তাদের দাবী আদায় করতে সক্ষম হয়নি। এর জন্যে উৎপীড়িত শ্রমিক শ্রেণীকে বছরের পর বছর আন্দোলনকে সঙ্গে নিয়ে সংগঠিতভাবেই পথ চলতে হয়েছে।

১৮৮৬ সালের ১লা মে-র ধর্মঘটের ডাকই আন্তর্জাতিক শ্রমিককে একই মঞ্চে টেনে আনে। বিশেষ করে শিকাগোর আন্দোলনের জঙ্গীরূপ, গোটা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষকে যে উদ্বুদ্ধ করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বলাই বাহুল্য আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘটের সফলতাই পরবর্তীকালের আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনকে যে আরো বেশী সংহতির বন্ধনে বাঁধতে পেরেছিল তা একটি পরিসংখ্যানেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। বিংশ শতাব্দীর মাত্র একটি বছরে অনুষ্ঠিত ধর্মঘটের পরিসংখ্যান থেকেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাবের দৃষ্টান্ত প্রমাণিত হবে:[২২]

দেশের নাম	বিবাদ	ধর্মঘটীর সংখ্যা	ধর্মঘটের দিন
আর্জেন্টিনা	৮২	৪৯৯৯৩	৫১৭৬৪৫
অস্ট্রেলিয়া	৩৪২	৯৬১৭৩	৫৫৭১১১
বেলজিয়াম	২০৯	৮১৫৪৪	৬৪৭৬৪৭
কানাডা	২৭৪	৭১৯০৫	৮৮৬৩৯৩
চেকোস্লোভাকিয়া	৪৩৮	১২০০৫৮	১১২৮৭২০
ডেনমার্ক	২২	১৩৭২	২১০০০
আয়ার	১৪৫	২৬৭৩৪	১৭৫৪৭৪৯
এস্‌থোনিয়া	৫	৬১২৯	১১০৯
ফিনল্যাণ্ড	৩৮	৬১৬৮	১৮৩৭২৯
ফ্রান্স	১৭০৯১	২৪২২৮৪৪	×
জার্মানী	৬৪২	১২৭৫৮৭	১১১২০৫৬
গ্রেট বৃটেন	১১১২	৫৯৫০০০	৩৪২৭০০০
ভারতবর্ষ	৩৭৯	৬৪৭৮০১	৮৯৮২২৫৭
জাপান	৫৪৭	৩০০০০	১৬২৫৯০
নেদারল্যাণ্ডস্	৯৫	৫৬৩০	৩৮৮০০
পোল্যাণ্ড	২১০৩	৫৪২১৬৫	৩২৯৭১০৫
স্পেন	৫৯৪	৭৪৮৮৭৮	১১১০৩৪৯৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪৭৪০	১৮৬০৬২১	২৮৪২৪৮৫৭
যুগস্লাভিয়া	৩৯৭	৮৭৭০০	১৫৫৫৯৫২

আন্তর্জাতিক ধর্মঘটের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনায় বলা যায়, পৃথিবীর যে কোন দেশে শ্রমিক আন্দোলনের শেষ ও চূড়ান্ত অস্ত্র হচ্ছে ধর্মঘট। ধর্মঘট যে কোন আন্দোলনের শীর্ষবিন্দু এবং সর্বহারার বিপ্লব সাফল্য মণ্ডিত করার সহায়ক শক্তি; যাকে সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে শোষণ ও সামাজিক বিরোধমুক্ত এক নতুন সমাজ গঠনের সহায়ক বিধি বলে মেনে নিতে অসুবিধা নেই।

ঘ.

ভারতীয় শ্রমিক ঃ

আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলনে ধর্মঘটের মাত্রা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই

আনুপাতিক হারে পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মঘট ব্যাপ্তি লাভ করে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট যখন তুঙ্গে—তখনো ভারতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন অনেকটাই অপরিচিত বিষয়, এখানে শ্রমিক সংগঠনের জন্য কোন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় নি। ভারতবর্ষে শ্রমিকদের পক্ষে ব্যাপকভাবে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার মতো মানসিকতাই গড়ে ওঠেনি। তবে ভারতে উপার্জক শ্রেণীর চেতনা ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়েছে প্রতিকূল পরিবেশের কারণে। ভারতে অর্থনৈতিক সংকট যত ঘনীভূত হয়েছে, শ্রেণী সংগ্রামের দিকটিও ততই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মঘট শ্রেণী-চেতনাকে সমাজবিকাশের আন্দোলনের সঙ্গে যেমন একীভূত করতে পেরেছিল, ভারতের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। ভারতের ধর্মঘট এবং আন্দোলনের প্রথম যুগগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘটের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংগঠনী শক্তি ব্যতীরেকেই তদানীন্তন কালের শ্রমজীবী শ্রেণীর ধর্মঘট সাফল্য অর্জন করলেও, যে হারে ও যে প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মঘটে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলো, ঠিক সেই অর্থে ভারতীয় শ্রমিকদের ধর্মঘট বা সেই ধরণের আন্দোলন সমাজের উৎপাদন শক্তির উপর প্রভুত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়নি। সঠিক নেতৃত্বের অভাবেই ভারতের শ্রমিক সংগঠন ধর্মঘটের কৌশলটিকে কার্যকরী রূপে প্রয়োগ করতে অক্ষম হয়েছিল। তবে ভারতের শ্রমিক সংগঠনের জন্ম স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট আন্দোলনগুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবেই সংগঠিত হয়। শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র যে সংগঠন, সেই সংগঠনের একান্ত অভাব ভারতের ধর্মঘটের প্রথম যুগেই উপলব্ধি করা গিয়েছিলো। নেতৃত্বের যথার্থ দুর্বলতা ও দৃঢ়তার অভাবে ভারতের প্রায় অসংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীকে বৃটিশ পুঁজি কোণ ঠাসা করে রাখে এবং যার বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা ভারতীয় শ্রমিকের ছিল না।

১৮৬২ সালের পরবর্তীকালে গোটা ইউরোপ মহাদেশে শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘটের ব্যাপ্তি যখন দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে গেছে তখনও ভারতীয় শ্রমিকের পক্ষে আন্দোলনকে সংগঠিত করে, কোন দাবী আদায় করা সম্ভব হয়নি বা কাজের ঘণ্টা কমানোর বিষয়ে ভারতীয় শ্রমিকের কোন সংগ্রামী চেতনাই বিকশিত হয়ে উঠেনি। ১৬ ঘণ্টা কাজ করা একজন শ্রমিকের পক্ষে সাধারণ ঘটনা ছিল। আন্তর্জাতিক ধর্মঘটের প্রেরণা তো দূরের কথা,

নিজেদের সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন না তাঁরা। এক জন ভারতীয় শ্রমিক একজন ক্রীতদাসের চেয়ে বেশী কিছু বাড়তি সুযোগ পায়নি। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শ্রমিকেরা দাসই ছিল।

ভারতীয় শ্রমিকের খণ্ড-বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের প্রেরণা আন্তর্জাতিক পটভূমি থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় শ্রমিকের সফল যোগাযোগ না থাকার দরুণ ধর্মঘটের মূল প্রেরণা ব্যাহত হয়েছে, যে কারণে ১৮৬২ সালে হাওড়া রেল ষ্টেশনের কর্মচারীরা আট ঘণ্টা কাজের দাবীতে আন্দোলন সংগঠিত করলে তা কার্যতঃ ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ধর্মঘটের প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন থেকে জন্ম নেওয়ার ফলে, আন্তর্জাতিক ধর্মঘট ও আন্দোলনের কোন শিক্ষাই এর মূলে ছিল না। খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ধর্মঘটের প্রেরণা থেকেই ভারতীয় শ্রমিক-কর্মচারীদের ঐক্য এবং অগ্রগতির দিকে যেতে সাহায্য করে। অন্যান্য দেশে যেমন ধর্মঘট আন্দোলনগুলি শ্রমিকশ্রেণীকে দৃঢ়তা ও সংহতির প্রশ্নে উদ্দীপ্ত করেছে, ভারতের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কোন যোগ্য শিক্ষা ব্যতীরেকেই খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ধর্মঘটগুলিই তাদের পরবর্তী সংগ্রামের ইতিহাসকে দৃঢ়তা দান করে। ফলে, সেদিনের ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত জঙ্গী ভারতীয় শ্রমিকই হয়েছিল আগামী দিনের সংগ্রামী সংগঠক।

ভারতীয় শ্রমিকদের আন্দোলনের কোন বিশেষ ভূমিকা না থাকলেও, ১৮৬২ সালের হাওড়া ষ্টেশনের রেলওয়ে কর্মচারীদের আট ঘণ্টা কাজের দাবীতে আন্দোলনই ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ইতিহাসের সূচনা করে, যা তাদের সংগ্রামের পক্ষে এক গৌরবময় অধ্যায়। বিচ্ছিন্ন ঘটনা-মাত্র হলেও, এই ধর্মঘটের প্রেরণায় আন্তর্জাতিক প্রভাব না থাকলেও, একটি পেছিয়ে পড়া দেশের শ্রমিকদের পক্ষে এই আন্দোলন অনেক বেশী মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। এবং যা খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামী চেতনার প্রাক্‌শর্ত হিসাবে 'ক্রমে ক্রমে পরাক্রান্ত শক্তি হয়ে ওঠে।' তাই আন্তর্জাতিক ধর্মঘটের প্রেরণা থেকে ভারতীয় ধর্মঘট ও আন্দোলনের জন্ম হয়নি। 'পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবী মানুষ নিজ নিজ দেশের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী, বিভিন্ন সময়ে ধর্মঘট করেছেন এবং ধর্মঘটকে আন্দোলনের পথ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন।' ভারতের ক্ষেত্রেও তেমনটিই ঘটেছে।

৯.

ধর্মঘট ও বয়কট

প্রাচীন ভারতে ধর্মঘটের সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্যগুলি কি ও কেমন ছিল এবং তার উৎসের ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করেছি। আমরা জেনেছি যে, প্রাচীনকালে ভারতে ধর্মঘটের অর্থ ও প্রেরণা ভিন্নতর ছিল। ধর্মঘট শব্দটি তখন হিন্দুর ব্রত হিসাবে উৎযাপিত একটি অনুষ্ঠানকে বোঝাত। ধর্মার্থে যে ঘট ব্যবহৃত হয়েছে তাকেই 'ধর্মের ঘট' বা ধর্মঘট হিসাবে শ্রদ্ধা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরাও ধর্মঘট বসিয়ে প্রতিজ্ঞা পালন করেছে। ধর্মঘট শব্দটি বেশীদিন হয়নি তাব প্রাচীন অর্থের খোলস বদলেছে। মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মঘট শব্দটি ধর্মের আবরণ ছেড়ে রাজনীতির অন্দর মহলে প্রবেশ করেছে। যা প্রাচীন ভারতে ধর্মের অঙ্গ ছিল, সেই 'ধর্মঘট' শব্দটি পরবর্তীকালে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অস্ত্র হিসাবে ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনেব সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

ইংরেজীতে যাকে Strike বলা হয়, বাঙলা অর্থে তাকে আমবা 'ধর্মঘট' বলেই জানি। অর্থাৎ Strike-এব পরিপূরক শব্দ হিসাবে 'ধর্মঘট' শব্দটির ব্যবহারের ইতিবৃত্ত তেমন জানা না গেলেও, প্রাচীন ভারতে ধর্মঘট শব্দটি যে প্রতিজ্ঞাপূর্বক কাজ বন্ধ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছিলো এমন মনে করা যেতে পারে। সেই কাম-কাজ-বন্ধের স্মৃতিই বোধ করি strike এর প্রতিশব্দ হিসাবে বাঙলায় ধর্মঘট শব্দটিকে ব্যবহারের কালে কাজ করেছে। ভারতে শ্রমজীবী মানুষেব বাঁচার লড়াই ও অধিকার রক্ষার বিষয়ে ধর্মঘটই প্রেরণা যুগিয়েছে। তাই ইংরেজী 'স্ট্রাইক' ও তার প্রতিশব্দ বাঙলা 'ধর্মঘট'কে মেনে নিতে অসুবিধা হয় না।

ইংলণ্ডের শ্রমজীবী মানুষের শোষণ-বঞ্চনার স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং তাদের ন্যায় সঙ্গত সহানুভূতি জ্ঞাপনের বহিঃপ্রকাশ ইংরেজী স্ট্রাইকের মধ্যে ধরা পড়েছে। কিন্তু বাঙলা 'ধর্মঘট'-এ তেমন কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি। আমাদের 'ধর্মঘটে'র প্রথম পর্বের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যেতে পারে যে, এ-দেশের ভূমিহীন কৃষকদের দুর্দশা আর তার প্রতিবাদে তাদের ধর্মঘট আন্দোলনকে ইংলণ্ডের শ্রমিকদের স্ট্রাইক আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। 'ইংলণ্ডের শ্রমিকরা 'সবচেয়ে বেশী' পরিশ্রম করেও সবচেয়ে

কম মজুরী পায় এবং জাতীয় সম্পদের ন্যায্য অংশ থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। এই প্রাপ্য অংশ আদায়ের জন্যই তাদের স্ট্রাইক আন্দোলন'।[১] পরবর্তীকালে এই স্ট্রাইকের বৈশিষ্ট্যগুলিই ভারতের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমান্তরাল ভাবে দেখা দিয়েছে। এই আন্দোলনগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণে বলা যায় যে 'উভয় ক্ষেত্রেই সামাজিক বিপর্যয়ের সাধারণ লক্ষণ আছে। এই বিপর্যয় সমাজের উচ্চ এবং নিম্ন সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতার পরিণতি'।[২] সমাজ-ব্যবস্থার এই বৈষম্যমূলক চেতনা-প্রবাহই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ।

এই ধর্মঘট আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের 'বয়কট' আন্দোলনের একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্মঘট পালনের ক্ষেত্রে এদেশের শ্রমজীবী মানুষদের যেমন ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের অধিকার অর্জনের চেষ্টায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে, তেমনি বয়কট আন্দোলনেও সমস্ত কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার বর্জন করে অচল করে দেওয়ারই একটি দিক। ধর্মঘট ও বয়কট দুয়েতেই প্রতিবন্ধকতাই মুখ্য বিষয়। তাই ধর্মঘট বা বয়কটের মধ্যে মৌল পার্থক্য খুব বেশী নয়। পদ্ধতিগতভাবে দুটির বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। দুই পদ্ধতি—কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োজ্য না হলেও, আমাদের প্রাচীন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় বয়কট বা বর্জন নীতি দীর্ঘকাল থেকেই অনুসৃত হচ্ছে। প্রজারা রাজাকে স্বাভাবিক ভাবেই বর্জন করেছে বা বর্জন করতে পারতো। রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ঘটনা গোটা মুঘল যুগেই দেখা গেছে। মধ্যযুগের সাহিত্যেও এর প্রমাণ রয়েছে।

আমরা জানি মধ্যযুগের মুসলিম শাসনে রাজা-প্রজার সম্পর্ক যেমন ভালো ছিল, তেমনি তিক্তও ছিল। তিক্ত হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়—রাজার চেয়ে রাজার মধ্যস্বত্ব ভোগীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রজা নিপীড়নের সুযোগ নিয়েছে। কৃষক ও সাধারণ মানুষদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালানো ছিল সেকালের স্বাভাবিক ঘটনা। পর্যটক মানুচি এই অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন: "তাদের গাছের সঙ্গে বাঁধা হতো এবং ঘুষি ও কোড়া মারা হতো। এক ইঞ্চি গভীর ও এক ক্যারদা লম্বা ষাড়ের ল্যাজের মতো পাকানো দড়ির নাম 'কোড়া'। এর সাহায্যে তারা পাঁজরা ও হাড়ের বিভিন্ন অংশের ওপরে সর্বশক্তি দিয়ে মারত। বিভিন্ন জায়গায় প্রায় এক

ইঞ্চি গভীর দাগ বসে যেত ও চামড়া ফেটে যেত"।[৩] এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজার প্রতিরোধের কোন ক্ষমতা ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সম্ভবও হোত না। তবে এ সব অত্যাচারের প্রতিরোধে তাদের কাছে একটাই পথ খোলা ছিল,—'চাষবাস ত্যাগ করে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া। এই রকম ব্যাপক ভাবে স্থানান্তরে যাওয়া ছিলো ভারতীয় কৃষকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবাব প্রাথমিক অস্ত্র'।[৪] তারা যৌথভাবে স্বৈরাচারী রাজা কিংবা জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে দেশ কিংবা বাজ্য বয়কটের মাধ্যমে। এ ধরণের রাজ্য বর্জনের দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে রচিত কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের মধ্যে মেলে:

'কলিঙ্গ তেজিয়া সভা করিলা প্রয়াণ
বুলান মণ্ডল চলে হইয়া প্রধান'।

ভারতীয় কৃষকের এই দেশত্যাগ বা দেশবর্জনের ঘটনা একালের রাজনীতিতে বয়কট প্রথার অনুরূপ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংগঠিত নীল আন্দোলনেও কৃষকদেব মূল বক্তব্যই ছিল—'না খেয়ে মরবো তবু নীল চাষ কববো না।' ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রজাব নীলচাষ বর্জনের ঘটনাই তো নীলধর্মঘটের প্রেবণা।

বয়কট ও ধর্মঘট গুণগত দিক দিয়ে দুই ই অধিকার আদায়ের পন্থা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা দুই রাজনীতির ছত্রছায়ায় লালিত। গান্ধীজীর মতে 'বয়কট' এক প্রাচীন প্রথা। এটা জাতিভেদ প্রথার সমকালীন। এ-এক রকমের মারাত্মক বিধান যা অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রথা এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে জাতিচ্যুত ব্যক্তিকে আর সমাজ আতিথ্য বা সেবা দিতে বাধ্য নয়। প্রতিটি গ্রাম যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, তখন এ প্রথা কাজ করেছে। সেদিন একটি সামাজিক প্রথা হিসাবে বয়কট বা বর্জন নীতি ছিল ধর্মঘটের একটি অঙ্গ। এ-প্রসঙ্গ আগেই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এব সঙ্গে আমরা এও জানি যে, একঘরে করে দেওয়ার সামাজিক শাস্তিই কালক্রমে বয়কটে রূপান্তরিত হয়েছে, যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে ব্যাপক ধর্মীয় ভাবনা থেকে। যা পরবর্তীকালে বয়কটের স্বরূপ ধরা পড়েছে সর্বপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা অর্থে। ধর্মঘট শব্দটি রাজনৈতিক ধারণায় যেভাবে আশ্লিষ্ট হয়েছে, 'বয়কট' শব্দটি সে ভাবে ব্যবহৃত হতে পারেনি [illegible] রাজনৈতিক-

কি সামাজিক, কি ব্যক্তিগতভাবে 'বয়কট' শব্দটি সর্ব ক্ষেত্রেই ব্যবহারযোগ্য একটি প্রথা। কিন্তু 'ধর্মঘট' প্রথাটি সমষ্টিগত স্বার্থে ব্যবহৃত একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র।

'বয়কট' শব্দটি অন্যান্য অনেক শব্দের মতো বিদেশ থেকে আগত। এই শব্দটির হতিহাসও বেশ কৌতুককর : "প্রথম আয়ার্লণ্ডে ব্যবহৃত হয়। ক্যাপ্টেন চার্লস কালিংহাম বয়কট আয়ার্লণ্ডের এক ইংরেজ জমিদারের প্রতিনিধি রূপে কাজ করতেন। ১৮৮০ সালে প্রজারা যে হারে খাজনা দিতে চাইল, তা তিনি গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। এর ফলে ক্যাপ্টেন বয়কটকে তারা সর্বপ্রকারে বর্জন করে। ভৃত্যরা তাঁকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। তারা পত্র আদান-প্রদান ও খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে, তাঁর গৃহ প্রাচীরও ভেঙ্গে দেয়। বয়কটের যখন এইরূপে জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত তখন সরকার সৈন্যদল পাঠিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। 'বয়কট' কথাটি পরে বহুলভাবে দেশ বিদেশে প্রচারিত হয়েছে বলে শোনা যায়"।[৫] এ ধরণের বয়কট তো মহারাজ নন্দকুমারের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। 'বয়কট' শব্দটি নাকি ফরাসী, কেউ কেউ বলেন জার্মানী। ফরাসী শব্দ 'বয়কটিয়ারণ' থেকে 'বয়কট' শব্দটির উৎপত্তি। জার্মানী শব্দ—'বয়কোট্টিয়ণ' থেকে 'বয়কট' শব্দটি বাঙলায় এসেছে।[৬] সে যাই হোক, বর্জনহ বাঙলায় বয়কটের চেহারা নিয়েছে এই ভাবে : "To combine in refuesing to buy or sell a thing or to work for or to have any dealing with a person or firm or institution on account of difference of opinion on social or political question or the like."[৭]

ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে ছোট বড় ধর্মঘটের ভূমিকা যেমন শ্রমজীবী মানুষের মুখে ভাষা যুগিয়েছে, তেমনি 'বয়কট' আন্দোলন অর্থনৈতিক দিক থেকে বাঙলা দেশে এবং অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ যুগের সূচনা করেছিল।[৮] 'ধর্মঘট' ও 'বয়কট' মূলতঃ যুগ ও জীবনের প্রয়োজনকেই সিদ্ধ করেছে। উভয় পদ্ধতিই ভারতীয় রাজনীতির পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে আধুনিক রাজনীতির কৌশলগত প্রয়োগের মাধ্যমে। তাই ধর্মঘট ও 'বয়কট' দুই-এর উৎস যে প্রাচীন এবং কাছাকাছি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১০.

ধর্মঘট ও গান্ধীজী

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মঘটের প্রসঙ্গে শ্রমিক-মালিকের অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ব্রহ্মাস্ত্র হোল ধর্মঘট। বিশেষ করে কাল মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই ধর্মঘটকে শ্রমিকের সংগ্রামের এক কৌশল হিসাবে দেখেছেন। লেনিন ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার শ্রমিককে এক হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি প্রত্যেক ধর্মঘটের সময়েই সমাজতন্ত্রের প্রশ্ন, পুঁজির শোষণ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নকে, শ্রমিকদের মনে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। লেনিনের এই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি পৃথিবীর 'মেহনতী মানুষের সংগ্রামে দুরন্ত গতির সঞ্চার করেছিল।' আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনেও দেখা গেছে শোষকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখলের যে সংগ্রাম তার শিক্ষা লেনিনবাদ থেকেই উৎসারিত। লেনিনবাদই বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণীকে দীক্ষিত করেছেন প্রত্যক্ষ ধর্মঘটের ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হতে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনের বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে।

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম পর্বে যে সমস্ত ধর্মঘট পরিচালিত হয়েছে, তা মূলতঃ বিচ্ছিন্ন ও নেতৃত্ববিহীন। তা-ছাড়া তা কৌশলের দিক থেকেও ছিল বড় বেশী অসঙ্গত। এখনকার শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী 'ধর্মঘট'-কে সাফল্যের দান হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে সর্ব প্রথম একটা নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন দু-হাজার কয়লাখনির শ্রমিকের 'ধর্মঘট' দেখেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীর বীরত্ব কত দৃঢ় ও অনমনীয় হতে পারে, সে সম্পর্কে তিনি তাঁর 'মহান পদযাত্রা' অধ্যায়ে লিখেছিলেন: "ধর্মঘট পুরাদমে চলছিল, শ্রমিকের দল রেলে ও হাঁটা পথে চলছিল। দুইজন মহিলা অসীম সাহস-ভরে চার্লস টাউনে পৌছয়। পথে তাঁদের সন্তান বিয়োগ ঘটে। একটি শিশু মারা যায় চলার পথে অনাবৃত থাকার দরুন, আর একটি নদী পার হওয়ার সময় মায়ের কোল থেকে জলে পড়ে ডুবে যায়। নির্ভীক মায়েরা তবু দমে যেতে অস্বীকার করে, একজন বললে, 'আমরা মৃতের জন্য দুঃখ অনুভব করব না, আমাদের শত দুঃখানুভব

তাদের ফিরিয়ে দেবে না। যারা বেঁচে আছে তাদের জন্য কাজ করে যাব'।"[৮] সাধারণ মানুষের এই সংগ্রামী মনোভাব ও ত্যাগ স্বীকার গান্ধীকে অভিভূত করেছিল, তাঁর মনে দুরপনেয় দাগ কেটেছিল। পরবর্তী কালে অবশ্য গান্ধীজী ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯১৮ সালে আমেদাবাদের সুতা কলের শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনে তিনি নিজেকে যুক্ত করেন। তাঁদের আন্দোলনকে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনাও করেন। তিনি শ্রমিক কল্যাণে যেটুকু সংগ্রামী ভূমিকা নিয়েছিলেন তা এ ক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণীয়।

আমরা আগেই বলেছি যে, তিনি ধর্মঘট পালনের ক্ষেত্রে কিছু নতুন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিলেন। যেমন ধর্মঘট পালনের ক্ষেত্রে কোন হিংসার আশ্রয় নেওয়া চলবে না। ভিক্ষার উপর নির্ভরশীল হওয়া চলবে না। ধর্ম-ঘট যত দিনই চলুক না কেন অবিচল চিত্তে লড়াই করতে হবে এবং ধর্মঘট চলাকালীন অন্যত্র, সততার সঙ্গে, জীবিকা নির্বাহ করা যেতে পারে। গান্ধীজী প্রবর্তিত এই নীতি শ্রমিকেরা পালনে ব্রতী হয়েছিল। এবং তিনি আমেদাবাদের শ্রমিকদের আন্দোলন পরিচালনায় সাফল্য অর্জনও করে ছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি শিল্প-শ্রমিকদের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে ধর্মঘট নিয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। আমরা আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে ধর্মঘট পালনের যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা জেনেছি, সে বৈশিষ্ট্য গান্ধীজীর ধর্মঘট ভাবনার মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। তিনি এ সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন, যা আন্তর্জাতিক শ্রমিক ধর্মঘটের পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না। তবুও গান্ধীজী ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষকে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের জগৎ থেকে শাসকদের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে, ধর্মঘটের পথ গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

গান্ধীজী ধর্মঘটগুলিকে কেবল আন্দোলন কিংবা সংগ্রামের ভিত্তিতেই সংগঠিত করতে চাননি। তিনি আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধানে যে ধর্মঘট ডাকা হয় তার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকাকে পছন্দ করেন নি। বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত 'ধর্মঘট' শ্রমিক শ্রেণীর জীবন যাত্রা বিপর্যস্ত করে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। অর্থনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে রাজ-নৈতিক আন্দোলনের মিশ্রণের পরিণাম যে কি হতে পারে, সে সম্পর্কে তিনি

বলেছেন : 'এ ধরণের মিশ্রণের ফলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তো সাধিত হয়ই না বরং ধর্মঘটী শ্রমিকরা ধর্মঘটের দরুণ—তাঁদের জীবন যাত্রা বিপর্যস্ত না হলেও, বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে পড়েন।...রাজনৈতিক ধর্মঘটগুলিকে তাদের নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। এই ধর্মঘটকে অর্থনৈতিক ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত করলে বা মিলিয়ে ফেললে চলবে না। অহিংস কার্যক্রমে রাজনৈতিক ধর্মঘটের সুনির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। যথেচ্ছ ভাবে এর আশ্রয় গ্রহণ করলে চলবে না। এমন পরিকল্পিত ভাবে এগিয়ে যেতে হবে যাতে হিংসার সৃষ্টি না হয়'।[২] অর্থাৎ অহিংস পথেই ধর্মঘটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অধিকন্তু 'ধর্মঘট' হবে স্বতঃস্ফূর্ত, কোন রকম বাধ্য-বাধকতা আরোপ না করে যদি ধর্মঘট করা যায় তাহলে তাতে গুণ্ডাবাজী বা লুটতরাজের সম্ভাবনা থাকবে না। এ ধরণের ধর্মঘটের বৈশিষ্ট্য হবে ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা। জীবিকা অর্জনের জন্য ধর্মঘটীদের একক ভাবে কিংবা অপরের সহযোগিতায় কিছু কাজ করতে হবে। এই ধরণের কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে আগেই ভেবে নিতে হবে। অতএব আমরা বলতে পারি যে, গান্ধীবাদে ধর্মঘটের স্বতঃস্ফূর্ততাকে মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কমিউনিষ্ট মতবাদে স্বতঃস্ফূর্ততার কোন স্থান নেই; বরং আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামী অংশের ভূমিকাকে নস্যাৎ করে দেয়'।[৩]

এ ছাড়াও গান্ধীজী যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে শ্রমিকদের ধর্মঘটকে কাজে লাগানো অনুচিত বলেই মনে করেছেন। বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে ধর্মঘট পালিত হলে তা সাংঘাতিক ভুল হবে। এবং তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে : 'যতক্ষণ না শ্রমিকরা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং সর্ব সাধারণের কল্যাণের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত হচ্ছে ততক্ষণ তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা খুব বিপজ্জনক। তারা যতক্ষণ না নিজেদের অবস্থার এমন উন্নতি করছে যাতে দেহ ও মনকে সুরুচি সম্পন্নভাবে নির্বাহ করতে সক্ষম হয় ততক্ষণ তাদের কাছে এতো আশা করা যেতে পারে না। সুতরাং শ্রমিকরা, নিজেদের অবস্থার উন্নতি করে, নিজেদের আরও বিদিত করে, নিজেদের অধিকারের প্রতি জিদ রেখে, এমনকি যে মাল উৎপাদনে তাদেরও এক প্রয়োজনীয় অংশ আছে তার যথাযথ ব্যবহারের জন্য মালিকদের কাছে দাবি করে তারা শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক আনুকূল্য দেখাতে পারে। বস্তুত শ্রমিকদের প্রকৃত অভিব্যক্তি তখনই হবে

যখন তারা আংশিক মালিকের পদে নিজেদের উন্নত করতে পারবে।
অতএব, বর্তমানে কেবল শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করার উদ্দেশ্যেই ধর্মঘট হওয়া উচিত। আর যখন তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের বৃত্তির উন্মেষ হবে, তখন তাদের দ্বারা প্রস্তুত জিনিসের মূল্য নির্ধারণের জন্যও ধর্মঘট করা হবে'।[৪]

গান্ধীজী 'ধর্মঘট' প্রসঙ্গে যে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়, শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আশা করেছিলেন এবং তার ভিত্তিতেই ধর্মঘট যাতে সফল হয়, সে বিষয়ে কতকগুলো সাধারণ নিয়মানুসরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। সে সম্পর্কে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র ১৯২১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় দেখি: ১। ধর্মঘটের কারণ ন্যায্য হওয়া উচিত। ২। ধর্মঘটীদের মধ্যে ব্যবহারিক ঐকমত্য থাকা উচিত। ৩। যারা ধর্মঘট করবে না তাদের বিরুদ্ধে কোন হিংসাত্মক আচরণ করা উচিত নয়। ৪। ধর্মঘট চলার সময় ইউনিয়নের টাকার আশ্রয় ছাড়াই ধর্মঘটীদের নিজেদের জীবন নির্বাহ করার শক্তি থাকা উচিত। আর সেজন্য তাদের কোন প্রয়োজনীয়, উৎপাদক এবং অস্থায়ী কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত। ৫। যেখানে ধর্মঘটীদের স্থান পূরণ করার জন্য অন্য শ্রমিক যথেষ্ট সংখ্যায় থাকে সেখানে ধর্মঘট মোটেই প্রতিকারের পথ নয়। সেক্ষেত্রে অন্যায় ব্যবহার, অপ্রচুর বেতন অথবা এই রকম কোন বিষয়ের প্রতিকার কল্পে পদত্যাগই এক মাত্র উপায়'।[৫]

এ-ছাড়াও গান্ধীজী শ্রমিকশ্রেণীকে ধর্মঘটের প্রশ্নে তাঁর এক বৃটিশ বন্ধুর মুখপত্র 'নো মোর ওয়ার'-এ প্রকাশিত নির্দেশগুলি মানতে ভারতীয় শ্রমিকদের অনুরোধ করেছিলেন। এই নির্দেশগুলির প্রেরক ছিলেন মিঃ এ. ফেনার ব্রকওয়ে। ১৯২৬ সালের ১৮ই নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের শর্তগুলি এই রকম:

১। মানব জীবনের বিনাশকারী কোন সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করা যুদ্ধের বিরুদ্ধে কৃত ধর্মঘটের মতই শান্তিপূর্ণ কাজ [বন্দুকের গুলি যত লোককে মারে, যে বেতন মানুষকে ক্ষুধার্ত রাখে তাও ততগুলি লোককে হত্যা করে]।

২। যদি বলা হয় যে, এই অন্যায় অপসারণের জন্য 'বৈধ' উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে তবে সেই কথা যুদ্ধের বেলাতেও বলা যায়। [দু-বছর আগে ভোটদাতাদের মনে বেতন হ্রাস বা যুদ্ধের ধারণা ছিল না]।

৩। যদি বলা হয় যে, বেতন হ্রাসের বিরুদ্ধে ধর্মঘট [এবং বিশেষ করে সাধারণ ধর্মঘট] দেশ অথবা সরকারকে 'বলপূর্বক নমিত' করার প্রচেষ্টা তবে সেই কথা যুদ্ধ বিরোধী সাধারণ ধর্মঘটের বেলাতেও বলা যেতে পারে। আসলে, জাতির একটি বড় অংশ সমর্থন না করলে দুটির কোনটিতেই সাফল্যের সম্ভাবনা নেই।

৪। ধর্মঘটকে অর্থনৈতিক অবরোধের তুল্য করা ঠিক নয়। যেখানে বুভুক্ষার বিপদের প্রশ্ন সেখানে ধর্মঘটীরাই যন্ত্রণাভোগ করবে।

৫। কোন ধর্মঘট শান্তিপূর্ণ কিনা তার নির্ণায়ক তত্ত্ব হল সেই বৃত্তিটি যা থেকে এর উদ্ভব। কোন যুদ্ধ বিরোধী ধর্মঘটের হেতু যুদ্ধের পরিবর্তে সরকারের সদস্যদের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত হলে এবং তার মধ্যে যদি এমন মনোবৃত্তি থাকে যা গৃহযুদ্ধে পরিণত হতে পারে, তবে তা শান্তিবাদের কাজ হবে না। তেমনি মালিকের বা সরকারের প্রতি বিদ্বেষ অথবা সমাজবিরোধী মনোভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত বেতন হ্রাস-বিরোধী ধর্মঘটেও এই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু দুটিই শান্তিবাদের কাজ বলে গণ্য হবে যদি তাদের পিছনে কোন অন্যায়ের বিরোধিতা করার মনোভাব থাকে।

৬। যদিও এ কথা ঠিক যে, কখনো কথাবার্তায় এবং আরও অল্পমাত্রায় কাজের মধ্য দিয়ে ধর্মঘটীরা অশান্ত মনোভাব প্রদর্শন করেছে তবু আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই বলব যে আত্মত্যাগমূলক নৈতিক প্রতিবাদ করাই ছিল এই মহান ধর্মঘটের মুখ্য উদ্দেশ্য, সমাজবিরোধী শক্তি বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ এর প্রেরণা যোগায় নি। এইটির জন্যই ধর্মঘট আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ করেছিল আর তার মধ্যেই লোকেদের সংযমের রহস্যটিও লুকিয়ে ছিল।

যে শান্তিবাদ কদাচিৎ সামরিক যুদ্ধের মধ্যে নিষ্ঠুরতা দেখতে পায়, আর আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন নির্দয়তা রয়েছে তার প্রতি অন্ধ হয়ে থাকে, সেই শান্তিবাদের কোন মূল্য নেই। যে উদার মানবীয় আন্দোলন শুধু যুদ্ধেরই অবসান চায় না উপরন্তু ততটাই অশান্তিবাদী সভ্যতারও মোটামুটি অন্ত চায়, আমাদের শান্তিবাদ যদি তার মধ্যে প্রকাশিত না হয় তবে মানব জাতির অগ্রগতিতে তার কোন প্রয়োজন থাকবে না। তাহলে জীবনীসত্তা এর দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়েই অগ্রসর হয়ে যাবে।

বলাই বাহুল্য, গান্ধীজী তাঁর জীবন-দর্শনে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে

শান্তিবাদী ধর্মঘটের কামনায় আরোপিত শর্তগুলির সঙ্গে নিজেও একটি শর্ত যুক্ত করে বলেন যে: 'শান্তিবাদী ধর্মঘট কেবল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত যারা ঐ অপসরণীয় কষ্টের মধ্যে কাজ করছে'।[৬]

গান্ধীজী শান্তির পথে ধর্মঘটের যে কথা ব্যক্ত করেছেন, তার সঙ্গে তিনি ধর্মের ঐহিক কল্যাণকে যুক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেছেন ধর্মকে বাদ দিয়ে অহিংস ধর্মঘট সফল হতে পারে না। অহিংস ধর্মঘট তখনই সফল, যখন ধর্মঘট শ্রমিক কিংবা মালিক উভয়ের কোন ক্ষতি সাধন না করে। অহিংস ধর্মঘট প্রসঙ্গে তাঁর দৃঢ় মতামত ছিল যে, 'ধর্মঘট-ব্যাধির সংক্রমণের মৌলিক কারণ হল যে, জীবন অন্য জায়গার মত এখানেও তার মূল থেকে উৎপাটিত হয়েছে। ধর্মই হল জীবনের মূল।.... ধর্মীয় আধার থাকা সত্ত্বেও ধর্মঘট হবে, কেন না এ কথা কল্পনা করা যায় না যে সকলের ক্ষেত্রেই ধর্ম জীবনের মূল হয়ে যাবে। সুতরাং একদিকে শোষণেব চেষ্টা চলবে আর অন্যদিকে ধর্মঘট হবে। কিন্তু তখন এই সমস্ত ধর্মঘট শুদ্ধ অহিংস প্রকৃতির হবে।'[৭]

ধর্মঘটের সঙ্গে পুঁজিবাদের সম্পর্ক কি? আমরা জানি পুঁজিবাদের সঙ্গে ধর্মঘটের সম্পর্ক অহি-নকুলের। পুঁজির সঙ্গে শ্রমিকের লড়াই কোন নতুন ঘটনা নয়। বরং পুঁজিবাদের জন্মলগ্ন থেকেই শোষণ পদ্ধতি যেভাবে হোক বজায় রাখার প্রবণতার বিরুদ্ধেই শ্রমজীবী জনগণকে রুখে দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু গান্ধীজী পুঁজিবাদ ও ধর্মঘট-এর বিশ্লেষণ অন্যভাবে করতে চেয়েছেন। তিনি এক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলেন নি। শ্রমিক ও পুঁজিপতি উভয়কেই অহিংসা ও সহানুভূতিপূর্ণ পথে মীমাংসা করার উপদেশ দিয়ে শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে সরল সম্পর্ক গড়তে চেয়েছেন। 'হরিজন' পত্রিকার ৩১শে মার্চ ১৯৪৬ সালের একটি সংখ্যা থেকে গান্ধীজী 'পুঁজিবাদ ও ধর্মঘট' সম্পর্কে কি নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা জানা যায়: 'শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে ধনিকদের আচরণ কি রকম হবে? এই প্রশ্ন আজ সর্বত্রই এবং বর্তমানে তার গুরুত্বও খুব বেশি। এর একটি পথ হল দমনের পথ এবং যাকে 'আমেরিকান' বলা হয় বা ঐ নাম দিয়ে বিদ্রূপ করা হয়। এই পথে গুণ্ডা লাগিয়ে শ্রমিকদের দমন করা হয়। প্রত্যেকেই একে অন্যায় ও ধ্বংসাত্মক বলে মনে করেন। অন্য পথটি ন্যায় ও সমাধানের পথ। তাতে প্রত্যেক ধর্মঘটের গুণাগুণ বিচার করে শ্রমিককে

তার প্রাপ্য দিতে হয়। সেই প্রাপ্য ধনিকেরা ঠিক করেন না, শ্রমিকরা নিজেরাই তা স্থির করেন এবং তাতে শিক্ষিত জনমতের সমর্থন থাকে।

'সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক নিজ দাবি সম্বন্ধে অধিকতর উগ্র হয়ে উঠছে। তার দাবিও নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সেই দাবি স্বীকার করবার জন্য অধীর হয়ে হিংসার আশ্রয় নিতেও সে দ্বিধা করছে না। সেই উদ্দেশ্যে নতুন নতুন উপায়ও অবলম্বন করা হচ্ছে। শ্রমিকরা মালিকদের সম্পত্তি নষ্ট করতে কলকব্জা বিগড়ে দিচ্ছে, যে সব বৃদ্ধ এবং স্ত্রী লোকেরা ধর্মঘটে যোগ দেয় না তাদের উত্যক্ত করতে এবং শঠ শ্রমিকদের বল প্রয়োগে আটক করে রাখতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। এই পরিস্থিতিতে মালিক তাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবেন ?

'মালিকদের প্রতি আমার উপদেশ হল যে, যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাঁরা নিজেরা সৃষ্টি করেছেন বলে মনে করেন, শ্রমিকরাই যে সেগুলির প্রকৃত মালিক একথা স্বেচ্ছাপূর্বক তাঁরা মনে করুন। শ্রমিকদের ভালভাবে শিক্ষিত করে তোলাকেও তাঁরা নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করুন ; তাতে শ্রমিকদের সুপ্ত ধীশক্তির উন্মোচন হবে। শ্রমিকদের একতার দ্বারা যে শক্তির সৃষ্টি হয়, তাকে খুশী মনে বিবর্ধিত করা এবং স্বাগত করাও মালিকদের কর্তব্য।

'এই মহান কাজ মালিকেরা একদিনে করতে পারবেন না। অন্যদিকে ধর্মঘটীরা যাঁদের কলকারখানায় ধ্বংসাত্মক কাজ চালাবে তাঁরা কী করবেন ? এ-ক্ষেত্রে মালিকদের আমি বিনা দ্বিধায় এই পরামর্শ দেব যে, তাঁরা ধর্মঘটী-দের কারখানা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করুন। কেননা, কারখানা তুল্যভাবে শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই। কিন্তু অসন্তুষ্ট মনে নয়, বরং উচিত মনে করেই তাঁরা কারখানা ত্যাগ করবেন এবং তাঁদের সেই সদিচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ শ্রমিকদের তাঁরা নিজেদের ইঞ্জিনিয়ার ও অন্য দক্ষ কর্মচারীদের দ্বারা সাহায্য প্রদান করবেন। মালিকরা শেষ পর্যন্ত দেখবেন যে, এর দ্বারা তাঁরা কিছুই হারাননি। বস্তুত তাঁদের প্রকৃত পথ অবলম্বনের ফলে বিরোধিতা নিস্তেজ হয়ে যাবে এবং তাঁরা তাঁদের শ্রমিকদের আশীর্বাদ লাভ করবেন। এর ফলে তাঁদের দিক থেকে পুঁজির উচিত ব্যবহার হবে। আমি এই কাজকে পরোপকার বলে মনে করব না। এই কাজের দ্বারা পুঁজিপতিরা তাঁদের লব্ধবিত্তকে বুদ্ধিপূর্বক ব্যবহার করবেন, আর শ্রমিকদের প্রতিও ন্যায় ব্যবহার করবেন। এর ফলে শ্রমিকরাও তাঁদের সম্মানিত অংশীদারে

পরিণত হবেন।[৮]

গান্ধীজীর এই ভাবনার ফল কি, তা আজকের ভারত বা পৃথিবীর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। যুক্তির দিক থেকে ধর্মঘট ও পুঁজিবাদ প্রসঙ্গে গান্ধীজীর অস্বচ্ছ নির্দেশ শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের অন্তরায় বলেই মনে হবে। তিনি যেভাবে, অহিংস এবং শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের শর্তাবলী সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন করেছেন, তা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই হোক আর বিদেশের ক্ষেত্রেই হোক, কখনই সফলভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। যেমন তিনি বলেছেন 'সর্বত্রই ধর্মঘট হচ্ছে। আমেরিকা ইংল্যাণ্ডও বাদ নয়। কিন্তু ভারতে ধর্মঘটের একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে? আমরা একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় বাস করছি। ঢাকনাটা সরে গেলেই স্বাধীনতার হাওয়া প্রবেশ করবে। তখন ধর্মঘটের সংখ্যাও বেড়ে যাবে। এই ধর্মঘট এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ায় মূল কারণ হলো এখানে অন্যান্য জায়গার মতই জীবন উৎকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ধর্মের ভিত্তি হারিয়ে ফেলেছে। এটা একটা অদ্ভুত অবস্থা। তবে, আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকলেও ধর্মঘট থাকবে। কারণ এটা ভাবা কঠিন যে ধর্ম সকলেরই জীবনের ভিত্তি হবে। সুতরাং একদিকে যেমন শোষণের চেষ্টা চলতে থাকবে, অপর দিকে তেমনি ধর্মঘটও চলতে থাকবে। তবে সে সময় এইসব ধর্মঘটের মূল চরিত্র হবে অহিংস। এ হবে এমন এক ধরণের ধর্মঘট যাতে কারো কোন অনিষ্ট হবে না'।[৯] জানি না গান্ধীজীর এ-ভাবনা শ্রমিকদের পক্ষে কতখানি গ্রহণীয় হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ফরাসী মনীষী রোম্যাঁ রোলাঁর মন্তব্যও যুক্ত করে দেখা যেতে পারে যে গান্ধীচিন্তা কতখানি যুক্তিসহ: 'শ্রেণী বিরোধ ও শ্রমজীবীদের সংগ্রামের প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি যা লিখেছেন তা থেকে দেখা যাবে, পৃথিবীর রক্তক্ষয়ী পদযাত্রা যে নব পর্যায়ের পথে এগিয়ে গেছে সে সম্বন্ধে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ রূপে অনবহিত। যেখানে সৌভ্রাত্রপূর্ণ হৃদয়বত্তা বর্জিত ছিল না, প্রাচীন সমাজের সেই সেকালে শ্রেণী-বৈষম্যের ধারণাতেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আবদ্ধ। এবং তাঁর কাছে পুঁজিবাদের ছবি ঐ আমেদাবাদের বিরাট বস্ত্র-উৎপাদকদের রূপ নিয়েই সর্বদা দেখা দেয়, ধার্মিক ও সজ্জন হিসাবে যাঁরা তাঁর কথায় প্রভাবিত হন এবং যাঁরা তাঁদের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কবিহীন নন। সেই নব্য শাসন যন্ত্র, সেই অবয়বহীন, হৃদয়হীন ধনতন্ত্র, সেই বৃহদাকার যৌথ কোম্পানী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-পরিষদ, সেই অন্ধ বিকটাকার

রাক্ষসগুলির সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় হয়নি—রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী যে যন্ত্র-দানবের বিরুদ্ধে বহু নিরর্থক তীর নিক্ষেপ করেছেন তার চাইতেও এরা বহুগুণ ভয়ঙ্কর, কারণ এই ধনতন্ত্রই বর্তমানের অদৃশ্য মহাযন্ত্র। এই মহাযন্ত্রই আজ বিভিন্ন রাষ্ট্রকে এবং জনমতকে পরিচালনা করে। এই যে অবয়বহীন, নামহীন, মনুষ্যত্বের পরিশিষ্টাংশের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন যন্ত্রশক্তি, এর কার্য প্রণালী আর রক্ত মাংসে গড়া মানবগোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তি বা এমন কি স্বেচ্ছাচারী প্রজাপীড়কের নৃশংস কার্যপ্রণালীও কি কখনো এক গোত্রের হতে পারে'?[১০] মনীষী রোলাঁ লিখিত গান্ধী-চিন্তার ব্যাখ্যায় কোন দ্বিধার অবকাশ নেই এবং তিনি তাঁর বক্তব্য সমর্থন করতে গিয়ে কোন অবান্তর যুক্তিও প্রয়োগ করেন নি। এই কারণে এবং আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই গান্ধীর 'অহিংস ধর্মঘট' কিংবা ধর্মঘট ও পুঁজিবাদ সম্পর্কিত ভাবনাগুলি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি না।

অতএব আমরা যদি বলি যে, গান্ধীজী যে ধর্মঘট-নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং যে বিশ্বাস তিনি জনগণের ভিতরে প্রচার করতে চেয়েছিলেন তা গণ-উদ্যোগ সৃষ্টিতে ভ্রান্ত—তা হলে খুব বেশি অন্যায় হবে না। এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের ধর্মঘট এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন রকমেই জন-সমর্থন পেতে পারে না এবং পায়ও নি। গান্ধীজীর ধর্মঘট ভাবনা 'বুর্জোয়া রাজনীতির তত্ত্ব ও প্রয়োগে' বাস্তব কোন শ্রেণী-সংগ্রামের লক্ষ্য-জাত নয়। বরং তাঁর এই দর্শনের ফলে অবাধ গণ-আন্দোলনগুলির গতি ব্যাহত হয়েছে। এবং এও স্বীকার্য 'অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন দেশের শিল্প ও রাজনৈতিক জীবনে যে আন্দোলনগুলি সংঘটিত হয় তাই-ই ধীরে ধীরে, শ্রমিক শ্রেণীর প্রাথমিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়নে দৃঢ়বদ্ধ হতে থাকে'।[১১] কিন্তু গান্ধীজী যে-ভাবে ধর্মঘট ও অপরাপর আন্দোলনগুলি সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন এবং যে দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মঘটের ব্যাখ্যা দিয়ে-ছিলেন তা শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থের পরিপন্থী। এ-জন্যেই পরবর্তীকালে, গান্ধীবাদের প্রতি আস্থা না রাখতে পেরে আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক জাতীয়তাবাদী তরুণ কর্মী, 'শ্রমিক-শ্রেণীর সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে দিয়ে, শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধারণা এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের আদর্শ গ্রহণ করেন'।[১২] এঁরাই পরবর্তীকালে কমিউনিষ্ট নামে পরিচিত হন।

সব শেষে, ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর ধর্মঘট ভাবনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের বা শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসাবে 'ধর্মঘট'কে রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করার আগ্রহ তিনি প্রকাশ করেন নি। তিনি ধর্মঘট প্রসঙ্গে যেটুকু ভাবনাচিন্তা করতে চেয়েছিলেন তা উপরোধ, অনুরোধ ও হৃদয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে। কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি যে: 'কোন শ্রেণী স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করে না; ভাবপ্রবণতায় কোন আদর্শবাদীর মহৎ বাণীর প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে এখানে সেখানে কোন ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা ও সম্পদ ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু যে সামাজিক রূপান্তরের কল্পনা করেছেন দূরদ্রষ্টা ও সংগ্রামরত বস্তুবাদী বিপ্লবীরা তাতে শ্রেণী হিসাবে জমিদার, ধনিক এবং অন্যান্যরা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে না'।[১৩] এর জন্যেই শ্রমিকের রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের পক্ষে 'ধর্মঘট' বা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই একমাত্র পথ; আর সেই পথে গান্ধীবাদী গণচেতনা ও দর্শনেব অস্বচ্ছ ভাবালুতা এক বিরাট প্রতিবন্ধক ছাড়া আর কিছুই নয়।

১১.

বাঙলা সাহিত্য ও ধর্মঘট

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে ও গণজীবনে ধর্মঘটের প্রভাব ব্যাপক ভাবে না পাড়লেও, ধর্মঘটের মূল প্রেরণা কোন অংশে কম ছিল না। ধর্মঘট কেবলমাত্র জন-জীবনেই অবলম্বিত হয় নি, কিংবা শ্রমজীবী মানুষের বাঁচার প্রেরণায় সর্বব্যাপিনী হয়ে ওঠেনি, ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব সমাজ-জীবনের সর্বত্রই সম্প্রসারিত হয়েছিল। ধর্মঘটের হিতবাদী সত্যানুসন্ধিৎসার শিক্ষা সামগ্রিক ভাবে না হলেও এদেশের এক শ্রেণীর মানুষের জীবনে কি ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, তার অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যেও মেলে।

বাঙলা সাহিত্যের একটি শাখা নাট্যসাহিত্য। এই নাটক বাঙালীর সমাজ জীবনে সঙ্গে যুক্ত। তাই সমাজ জীবনকে বাদ দিয়ে উনিশ শতকে কোন নাটকই রচিত বা সমাদৃত হতে পারেনি। নাটক শুধুমাত্র অভিনয়ের জন্যেই নয় সমষ্টির চিন্তা ও চেতনারও শরিক। সে-জন্যেই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী নাট্যকারেরাও সামাজিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে 'সমসাময়িক সমাজের রুচি-প্রকৃতি বা প্রয়োজনকেই নাটকের মধ্যে দিয়ে ···রূপ দেন। বাঙলার সামাজিক, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তিনধারার নাটক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা দেখতে পাই, সমাজের গতি-প্রকৃতির মূলধারাই নাট্যরচনার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল'।[১]

বাঙলা নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা নাটুকে রামনারায়ণ হলেও দীনবন্ধু মিত্র সেকালে নাটক রচনা করে সকলে টপ্‌কে গিয়েছিলেন। তিনি সমকালীন সমাজ সমস্যার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়েই নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন বলেই ১৮৫৯ সালে বাঙলার নীল ধর্মঘটের প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি হিসাবে নীলচাষকে কেন্দ্র করে 'নীলদর্পণ' নামে নাটকটি লিখতে অনুপ্রাণিত হন। নীল ধর্মঘটের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই 'নীলদর্পণের' জন্ম। যাকে যোগেশচন্দ্র বাগল 'রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাকুলের নিরুপদ্রব প্রতিরোধ।··· নীল বিদ্রোহ নয়, নীল ধর্মঘট'—বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর 'বিদ্রোহ ও বৈরিতা' গ্রন্থে। নীল ধর্মঘটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগই তাঁকে 'নীলদর্পণ' রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছে। "প্রজাদের দুঃখ স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষী

মাত্রেরই হৃদয়ে যে আগুন তখন জ্বলিয়াছিল, তাহা তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিতে ছিল। হৃদয়ের সেই আগুন লইয়াই তিনি 'নীলদর্পণ' লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন"।[২] আমরা 'নীলদর্পণের' কেন্দ্রীয় চরিত্র-গুলিকে নীলকরদের নির্যাতনের প্রতিবাদে সোচ্চার হতে দেখি। তাঁরা যেন সকলেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন নীল চাষ না করার প্রতিজ্ঞায়। 'নীলদর্পণের' অমরনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট বলে যিনি পরিচিত তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে নাট্যকার বলতে বাধ্য হয়েছেন: 'যদি খোদা বেঁচয়ে নাকে,·· 'আর শুমুন্দির নীল মামদো ঘাড়ে চাপ্‌তি পারবে না' [২।১]। বাঙলার নীলধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সেকালে অনেকেই নাটক রচনার প্রেরণা খুঁজেছেন। ১৮৬০ সালে 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়েছিল, এই নাটক প্রকাশিত হলে এদেশের লোকের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা যেন ধর্মঘটী নীল চাষীদেরই উক্তি: "'নীলদর্পণ' আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল; তোরাপ আমাদের ভালবাসা কাড়িয়া লইল; ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল; মনে হইতে লাগিল রোগকে যদি একবার পাই অন্য অস্ত্র না পাইলে যেন দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারি"।[৩]

নীলধর্মঘটকে কেন্দ্র করে আরও অনেক লেখক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখেছেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত,—যিনি আজীবনকাল নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সক্রিয় ছিলেন তিনি তাঁর কাগজের মাধ্যমে নীলকর বিরোধী জনমত গঠন করতে সমর্থ হন। ফলে 'সংবাদ প্রভাকরের' ৩০. ১১. ১২৬৬ বঙ্গাব্দে আমরা যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ পাই তা এই রকম:

'নদীয়া জিলার নীলকরদিগের সহিত রাইয়তগণের বিবাদ দিন ২ বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, তাহা নিবারণের কোন সদুপায় হয় নাই। চারি পাঁচ বৎসর হইল, আহার ও ব্যবহারীয় বিবিধ দ্রব্যের মূল্যাধিক্য হওয়াতে প্রজা-দিগের পরিশ্রমের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্বে দুই আনা পয়সা এবং জল-যোগ জন্য কিঞ্চিৎ তণ্ডুল দিলে এক ব্যক্তিকে সমস্ত দিবসের নিমিত্ত ক্ষেত্রের কার্যে নিযুক্ত করা যাইত, এইক্ষণে চারি আনা পয়সা না দিলে কোন ব্যক্তি আর সেই কার্য স্বীকার করে না। তাহারা অম্লান বদনে বলিয়া থাকে, যে আহারীয় দ্রব্যাদি যখন দুর্মূল্য হইয়াছে তখন তদুপযুক্ত বেতন প্রাপ্ত না হইলে কোনক্রমে আমাদের জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে না। যাঁহারদিগের শ্রম-

জীবি লোকের আবশ্যক হইতেছে তাঁহারা সুতরাং অধিক বেতন প্রদানে বাধ্য হইয়াছেন,...কিন্তু কি পরিতাপ, নীলকুঠির অধ্যক্ষ সাহেবেরা বহুকাল হইল, নীলের নিমিত্ত ভূমি প্রস্তুত ও তাহাতে বীজ বপন-বৃক্ষ প্রস্তুত এবং তাহা ছেদন করিবার নিমিত্ত যে ব্যয় নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছেন, নীলকুঠির এডবন্স দিবার নিয়ম চিরকাল সমান, যে ব্যাক্ত তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার আর নিস্তার নাই, সুতরাং জিলার দুঃখি লোক সকলে অল্প বেতনে নীলকরদের অধীনে কার্য স্বীকার করে না, যেহেতু এইক্ষণে যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তাহারদিগের উদরান্ন নির্বাহ হওয়া কঠিন হয়। এই কারণে সুতরাং নীলকরদিগের সহিত প্রজাগণের গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। নীলকরেরা দুঃখি কৃষকদিগকে ক্ষেত্রের কার্যে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত বলপ্রকাশ ও নানা প্রকার অত্যাচার প্রচার করিতেছেন, এবং **প্রজারাও একত্র হইয়া ধর্মঘট স্থাপন করিয়াছে, অল্প বেতনে আর নীলকরদিগের কার্য স্বীকার করিবেক না।**...'

কেবল দীনবন্ধু মিত্র কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই নন, সমকালীন বাঙালী লেখকদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র বসু, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, লাল-বিহারী দে প্রমুখের লেখায় নীলচাষীদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একমাত্র সম্পাদক-লেখক যিনি নীলধর্মঘটকে সফল করে তুলতে এক মহান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তিনি তাঁর সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার মাধ্যমে এদেশে নীলকরদের ভূমিকার কথা নির্ভীক ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।

১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে এদেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক ধর্মঘট পালন করে নীলচাষে অস্বীকৃত হলে, নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু পেট্রিয়টের প্রবন্ধগুলি পাঠে নীলকরেরা যে রুষ্ট হয়েছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ-কথার প্রমাণ মেলে নীলকরদের লেখা একটি পত্রের মধ্যে : 'নিগার! তুমি কি ভুলে গিয়েছ যে পলাশী যুদ্ধের পর থেকে তোমার জাতের অবস্থা ক্রীত-দাসদের চেয়ে বেশী নয়? ... যদি আমি তোমাকে কোনদিন শহরে অথবা গ্রামে দেখতে পাই তবে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে চাপকাব'।[৪] উনিশ শতকে নীল আন্দোলন নিয়ে যে কটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে ধর্মঘটের প্রকৃত স্বরূপটির কথা জানা

যায়। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল *English Strikes and Bangailee Dhurmghats*।[৫]

আমরা পূর্বেই জেনেছি যে দীনবন্ধু নীল ধর্মঘটে উদ্বুদ্ধ হয়ে, 'নীল-দর্পণ' নাটকে রচনা করেছিলেন। নীলকরদের অত্যাচারে নিরীহ প্রজার মর্ম-বেদনাকে ভাষা দিতে অপরাপর সাহিত্যকদেরও ভূমিকা কম ছিল না। মীর মুশারফ হোসেন এ-যুগের এমনই একজন সাহিত্যিক 'যিনি বাঙলা সাময়িকপত্রের নিয়মিত লেখক ও সংবাদদাতা। এই নবীন মুসলমান যুবক শুধু রচনা শক্তির গুণে নাগরিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং সম্ভবত তাদের সমাজের প্রতি হিন্দু সমাজের বদ্ধ দুয়ার কিছুটা উন্মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন'।[৬] মীর সাহেব নিজে জমিদার বংশের সন্তান হয়েও, নীলধর্মঘটের প্রেরণা তাঁকে কতখানি উদ্বুদ্ধ করেছিল তা তাঁর রচিত 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' রচনাখানিতে তার সার্থক প্রমাণ পাওয়া যায়। "শুধু নীলকরের অত্যাচারই নয়, নীলবিদ্রোহে প্রজা প্রতিরোধের যে চিত্র মীর সাহেব এঁকেছেন বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। নীল বিদ্রোহ-কালীন গণ-অসন্তোষ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং যার সামনে প্রবল অত্যাচারীকেও কেমন মাথা নত করতে হয়েছিল, 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' তারই সাহিত্য দলিল"।[৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষকদের কাছে নীল চাষ সাধারণ কোন সমস্যা ছিল না;—এ সমস্যা ছিল দরিদ্র নীলচাষীদের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ, তাই নীলচাষীর মৃত্যুপণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই তার নিষ্পত্তি হয়েছে; যার উজ্জ্বল ছবি মীর সাহেবের বলিষ্ঠ রচনা 'উদাসীন পথিকের মনের কথ'ায় ফুটে উঠেছে। নীলধর্মঘটের সামাজিক সমস্যাটির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রদায়ের সকলেই বাঙলা সাহিত্যকে অবলম্বন করেই নিজেদের আদর্শ এবং উদ্দেশ্যকে সফল করতে ব্রতী হয়েছিলেন। মীর সাহেবও তাই তৎকালীন উৎপীড়িত কৃষিজীবী সমাজের বাস্তব চিত্রটি অঙ্কন করতে গিয়ে নীলকরদের অত্যাচারে মূক ও নিরীহ কৃষকের ধর্মঘটে প্রতিজ্ঞ-দীপ্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন: 'নীলকরের দৌরাত্ম্য আগুনে আর কতকাল জ্বলিব। রাজগোচরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করিব সেও স্বীকার। তত্রাচ নীল আর বুনিব না'।[৮] সত্যিই সেদিন থেকে তাঁদের আর নীল বুনতে হয়নি।

এরপর মীর সাহেব নীলধর্মঘটী কৃষকদের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ মনোভাবের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অতুলনীয়: 'প্রাণের মায়া নাই, জীবনের আশা নাই, কোনরূপ সুখের ইচ্ছাও আর নাই।......আর কেন! রাজ সম্মুখেই ডুবিয়া মরিব। এই কথা মনে করিয়াই সহস্রাধিক প্রজা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, নদী স্রোতে অঙ্গ ভাসাইল। মহামতি লাট বাহাদুর মহা ব্যতিব্যস্ত হইলেন। ষ্টিমার থামাইতে আজ্ঞা করিলেন এবং ষ্টিমারস্থ সমুদায় জালি-বোট জলে নামাইয়া প্রজাদিগকে উঠাইতে আদেশ করিলেন। যাহারা সন্তরণ দিয়া ষ্টিমার ধরিল, ষ্টিমারের উপর উঠিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া দুরবস্থার বিষয় বলিতে লাগিল। ক্রমে সমুদায় প্রজা ষ্টিমারের চতুষ্পার্শ্বে, কেহ জলে, কেহ জালি বোটে, কেহ ডাঙ্গায় থাকিয়া আপন দুঃখের কান্না কান্দিতে লাগিল। প্রজার দুরবস্থার কথা শুনিয়া লাট বাহাদুর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল'।[৯] প্রজাদের দুঃখে কাতর লাট সাহেব তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সুবিচারের, তাদের আর্জি লাট সাহেব নত মস্তকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। নীলকরদের কোন ওজর-আপত্তি চলেনি। হাজার হাজার নীল চাষীদের ইচ্ছা শক্তির বিরুদ্ধে কোন ফন্দি-ফিকির কিংবা আইন সেদিন টেঁকেনি। মীর সাহেবের ভাষায়: 'অতি কম হইলেও কুড়ি হাজার কণ্ঠ হইতে শ্রীমতী মহারাণীর জয় ধ্বনি হইতে লাগিল—সেপাই, সান্ত্রী, প্রহরী, দারোগা, জমাদার স্বয়ং মাজিষ্টার সে গোলযোগ নিবারণ জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। প্রজার আনন্দ যেন আর ধরে না। জবরানে কেহ নীল-বুনানি করিতে পারিবে না। এই মহামূল্য কথায় প্রজার আনন্দ আজ হৃদয়ে ধরে না'।[১০] নীলধর্মঘটে বিজয়ী কৃষকের চরম আনন্দের প্রকাশ মীর সাহেব 'উদাসীন পথিকের মনের কথায়' নিজের চোখে দেখে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

নীলধর্মঘটকে কেন্দ্র করে আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী লেখকের রচনা ইতিহাস হয়ে আছে। ১৮৫৩ সালে নবদ্বীপের দারোগা গিরিশচন্দ্র বসু নীলকর ও রায়তদের তিক্ত সম্পর্কের কথা তাঁর 'সেকালের দারোগার কাহিনী' নামক গ্রন্থে উপস্থাপিত করেন। সেকালে নদীয়া জেলায় নীলকরদের জুলুম ও অত্যাচার ছিল অমানুষিক। গিরিশবাবু নিজ চোখে এসব অত্যাচার দেখেছেন। এবং সরকারী কর্মচারী হয়েও মনে মনে

ব্যথিত হয়েছিলেন। বেশীদিন তিনি মুখ বুজে সহ্য করতে পারেননি নীলকরদের দৌরাত্ম্য। নীল ধর্মঘটের কালে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল দামুরহুদা নামক একটি নীল উপদ্রুত অঞ্চলে। তিনি এখানে এসেই নীলচাষীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে নীলধর্মঘটকে সফল করার জন্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। নীলকর ও নীল রায়তের মধ্যে তিনি একটা ফাটল ধরাতে পেরেছিলেন। তিনি স্বচক্ষে যা দেখেছিলেন তার প্রকাশ করেছেন তাঁর গ্রন্থের 'নীলকুঠি' অংশে। নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক ও জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রেরণা যে 'ধর্মঘট', সেই ধর্মঘটের মূল প্রেরণাই এই অংশে ধরা পড়েছে: "নীলকরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব দাবানলের ন্যায় হু-হু করিয়া সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া জ্বলিয়া উঠিল। 'মোরা আর নীল করবো না' বলিয়া প্রজারা যে সুর ধরিল, তাহা আর কেহ নিরস্ত করিতে পারিল না। ধন্য প্রজার প্রতিজ্ঞা। নীলকর সাহেবদিগের এত দর্প, ক্ষমতা, এত ধন, —সকলই প্রজার প্রতিজ্ঞার সম্মুখে জলের মধ্যে মৃন্ময় প্রতিমার ন্যায় গলিয়া গেল। যে সাহেব দিগের ইঙ্গিতে শত সহস্র লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা আসিয়া একত্রিত হইত, তাঁহারই প্রজাদিগের ভয়ে কম্পিত হইয়া, স্বীয় স্বীয় প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে কৃষ্ণনগর ও যশোহর জেলার স্থানে স্থানে অশ্বারোহী সেনা আনিয়া স্থাপিত করিতে প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টও নীলকরের সাহায্যার্থ এই সময় এক বিশেষ আইন প্রকটন করিলেন যে,—যে সকল প্রজারা নীল করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে তাহারা নীল না করিলে কারারুদ্ধ হইবে। কিন্তু তাহাতেও প্রজারা ভয় পাইল না। বলিহারি প্রজাদিগের একতা এবং সাহস। তাহারা একস্বরে বলিল যে জেলখানায় যাওয়া তুচ্ছ কথা, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ফাঁসি দিতে চাহিলেও তাহারা গলা বাড়াইয়া দিবে, 'তবু মোরা নীল করবো না'।"[১১]

কৃষকের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য সত্যিই প্রশংসনীয়। গিরিশচন্দ্রের চাক্ষুস বর্ণনা ইতিহাস নয়, সাহিত্যিক উপাদানেও পরিপূর্ণ। নীলকরদের পরাক্রম শেষ হয়েছে প্রজাদের ত্রিবিধ অস্ত্রে। সেই ত্রিবিধ অস্ত্রের প্রধান হলো 'ধর্মঘট'। যে ধর্মঘটে 'প্রজাদের চিরশত্রু সংহারিত' হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের ভাষায়: 'নীলের চাষ উঠিয়া গেল এবং সাহেবরা জাল গুটাইয়া প্রস্থান করিলেন'।[১২]

গিরিশচন্দ্র বসুর মতো আর একজন দারোগাও নীল ধর্মঘটে নীলকরদের

অত্যাচারের কাহিনী ও নীল ধর্মঘটের প্রত্যক্ষ বিবরণটি টেনে এনেছেন 'বাঁকা-উল্লার দপ্তর' নামক একটি গ্রন্থে। যে গ্রন্থটিকে আমরা সমকালীন সমাজের সার্থক প্রতিচ্ছবি হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। গ্রন্থটির লেখক নদীয়া জেলার জয়রামপুর গ্রামের প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। প্রিয়নাথের আত্মীয়-স্বজনেরা ছিলেন নীলকুঠির কর্মচারী। এই সুবাদে তিনি নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এবং নিজেও দারোগার কাজে নিযুক্ত হওয়ার ফলে অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক নীলকরদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি স্বচক্ষে দেখেছেন। এবং সেই নিজে চোখে দেখারই কাহিনী লিখেছেন তিনি তাঁর 'বাঁকাউল্লার দপ্তর' নামের গ্রন্থটিতে। 'বাঁকাউল্লার দপ্তর'-এর গল্পগুলি নির্ভেজাল সত্য। খাঁটি কাহিনীর সত্যতা যতদূর সম্ভব বজায় রেখে গল্পের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 'কাহিনীর পরিবেশও নির্জলা খাঁটি সেকালের বাংলা দেশ। সুতরাং ইতিহাসের দিক দিয়ে বইটি চৌকস'।[১৩] গ্রন্থ হিসাবে 'বাঁকাউল্লার দপ্তর' নিছক কাহিনীর জন্যেই কাহিনী নয়, এর মধ্যে দিয়ে নীলকরদের অত্যাচারে কৃষকের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনের বাস্তব চিত্রই উপস্থিত করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের প্রজারাও রূপনগরের জমিদারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের বিরুদ্ধের ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন ধর্মঘটের ভিতর দিয়েই। গ্রন্থের 'দেওয়ানী' অংশে প্রজারা কিভাবে ধর্মঘটে সামিল হয়ে গেল তার নিখুঁত বর্ণনা লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন: "ব্রজেন্দ্রবল্লভ রায় চৌধুরী, রূপনগরের জমিদার নীলকর, মহাজন। রূপনগরেব প্রজারা হাতে গলায় জমিদারের কাছে বাঁধা। জমিদারের দোর্দণ্ড প্রতাপ, অসীম ক্ষমতা, অকুতো সাহস। তরফ রূপনগরের এলাকায়, বাঘে বাছুরে একঘাটে জল খায়। নিকটেই সরকারী দেওয়ানী ফৌজদারী আদালত আছে; আদালতে হাকিমেরা আছেন; হাতে কাজ নাই। মহাকুমার সর্ব্বত্রই তরফ রূপনগরের এলে-কাধীন। জমিদারই এলেকার দেওয়ান ফৌজদার। মালি মোকর্দমার একটিও সরকারী আদালত পর্যন্ত আইসে না; জমিদারই জজ, জমিদারই মাজিষ্ট্রেট। রূপনগরের প্রজারা ভূত খাটুনী খাটিয়া কিছু ফসল উৎপন্ন করে, সমস্তই জমিদারের গোলায় উঠে, আজীবনই প্রজারা জমিদারের গোলা হইতে ধান কর্জ করিয়া খায়; টাকা কর্জ করিয়া বাজার হাট করে। এই রূপেই প্রজাদের দিন কাটিতে ছিল; জমিদারের দুয়ারে জীবন বিনিময়

দিয়া তাঁহারই কৃপায় একবেলা বাসিমুখে জল দিতেছিল ; জমিদার দাদন বন্ধ করিয়াছেন। জমার উপর টাকার সিকি বৃদ্ধি না দিলে, জমিদার-মহাজন প্রজাকে আর ধান দিবেন না। প্রজারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে।

"একদিন গেল। মণ্ডল মাতব্বরদিগের বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পাইয়াছে ; ভাবিয়া চিন্তিয়া সলা-পরামর্শ করিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না। প্রাতে যে সব যুবা পুরুষেরা মাঠের কাজে গিয়াছিল, তাহারা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়া ভাত পাইল না। বেচারারা নীরবে রাত্রিযাপন করিল। পরদিন যাহারা খুবই সবল—তাহারা মাঠে গেল ; বুড়া ছোঁড়ারা ঘরেই রহিল। ইতিমধ্যে দেওয়ানজী মহাশয় প্রজাতলব দিলেন। জমিদারের বড় বড় বাঁশ লাঠি হাতে ভোজপুরী পেয়াদারা আসিয়া, অনাহার ক্লিষ্ট মণ্ডল লোকেদের কাছারী লইয়া গেল। দিনে দিনে বাকী-বকেয়া পরিশোধ না করিলে, দেওয়ানজী প্রজার জাত-আবরু খাইবেন। প্রজারা ফেল-জামিন দিয়া ঘরে ফিরিল। পাড়ার গোঁয়ার লোকেরা ধর্মঘট করিল। ধর্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, 'শালাদের দ্যাখ্—মার' কর। ধর—আর মার। খাজনা কেহ পাই পয়সাও দিব না। নালিশ করে, ফাটক খাটিব। বরকন্দাজ আসে, হাঁকাইয়া দিব, না শোনে—মরিয়া তাড়াইব।' তরফ রূপনগরের সাতশ মৌজায়—রাত্রির মধ্যে এই রূপ ধর্মঘট হইয়া গেল।"[১৪]

উনিশ শতকে জমিদারের এ ধরণের অত্যাচরের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজার স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটই সারা দেশের প্রজাদের ঐক্যবদ্ধ করার পক্ষে সহজ ও সরল ব্যবস্থা, যা সমকালীন সমাজে স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। যে কোন অ-সম নীতির বিরুদ্ধে প্রজার প্রতিবাদের সক্রিয় মাধ্যম হিসাবে ধর্মঘটই ছিল বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সেকালে যাঁরা এদেশের প্রজার কথাকে ভাষায় বাঙ্ময় করে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই কৃষিজীবীর সমস্যাকেই তুলে ধরেছেন, ফলে এদেশের কৃষক সমস্যা বাঙলা সাহিত্যকেও উপাদান যুগিয়েছে। ধর্মঘটের সামাজিক সীমাবদ্ধতা কিভাবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিব্যাপ্ত হয়েছে তারও প্রতিফলন ঘটেছে সাহিত্যে। তৎকালীন সু-প্রসিদ্ধ লেখক লালবিহারী দে তাঁর একটি গ্রন্থে গ্রাম বাঙলার সমাজ-জীবনের অন্তরঙ্গ চিত্র এঁকেছেন। সেখানেও ধর্মঘটের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ফুটে উঠেছে কৃষক জনসাধারণের মধ্যে। গ্রাম্য জমিদারের নিষ্ঠুর, অন্যায়-অত্যাচারের

বিরুদ্ধে প্রজাদের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে ধর্মঘটের মতো রাজনৈতিক কৌশলকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। লালবিহারী দে-র যে গ্রন্থটিতে 'ধর্মঘট' প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে, সেটি ইংরাজী ভাষায় রচিত —নাম *Gobinda Samanta*। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে।

বর্ধমানের রাঢ় অঞ্চলের আগুরী সম্প্রদায়ের কৃষিজীবী পরিবারের অকৃত্রিম ও বিশ্বস্ত চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। ইংরেজী ভাষায় লেখা হলেও, *Gobinda Samanta* বাঙালীর প্রথম গণআখ্যান। এই বইয়ের সবচেয়ে বড় সম্মান বিশ্বখ্যাত জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের প্রশংসালাভ। তিনি *Gobinda Samanta* পড়ে প্রকাশক ম্যাকমিলানকে লিখেছিলেন: 'I shall be glad it you would tell him with my compliments how much pleasure and instruction I derived from reading a few years ago Gobinda Samanta।'[১৫]

উক্ত গ্রন্থখানি বাঙলা ভাষাতেও অনূদিত হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন ভূকৈলাসের রাজা সত্যবাদী ঘোষাল। এই গ্রন্থের 'কামারশালায় রাজনৈতিক বৈঠক' শিরোনামে একটি অধ্যায়ে গ্রাম্য-জমিদার ও তার নায়েব-গোমস্তার অন্যায় অত্যাচার ও ইচ্ছামতো 'মাথট' আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার দরিদ্র প্রজারা ধর্মঘট পালনের মতো স্থির সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছেন। এই অধ্যায়টি পড়ে যেন মনে হয় 'দীর্ঘদীনের আলস্য ত্যাগ করে' এদেশের কৃষিজীবী জনগণ জেগে উঠেছে অন্যায়ের প্রতিকার করতে, আর প্রজাদের এই শ্রেণী-চেতনার উন্মেষ ধর্মঘট পালনের মধ্য দিয়ে উজ্জীবিত হতে চাইছে। বে-আইনী 'মাথট' আদায়কে কেন্দ্র করেই জোরালো প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে প্রজাস্বার্থেই। লালবিহারী দের গ্রন্থের অষ্টবিংশ অধ্যায় পাঠে উপলব্ধি করা যায় যে, 'বাঙলার ম্লান মূক কৃষকসমাজ শতাব্দীকালের জমাট বাঁধা চিন্তা ও কর্মের দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে—নিজেদের ওপর তারা আস্থা ফিরে পাচ্ছে'।[১৬]

সন্ধ্যাবেলায় চাষীরা সারা দিনের খাটুনির পর একটু গল্প-গুজব করার জন্যে রোজকার মতো কামারশালে আসেন। কামারশালে কুবের ও তার ছেলে নন্দের কাজের ফুরসৎ নেই। এত কাজের চাপেও বন্ধু-বান্ধবেরা প্রতিদিনই গল্প-গুজব করতে আসেন। পিতা ও পুত্রে লৌহখণ্ড পিটতে ব্যস্ত। সেই ব্যস্ততার মধ্যে চার পাঁচজন লোক মাদুরে বসে। লোহা-পিটুনি শেষে

লৌহখণ্ডকে আবার হাপরে দেওয়ার পর কপিল ও নন্দর কথাবার্তা শুরু হয় জমিদারের অন্যায় মাথট আদায়ের বিষয়ে। গাঁয়ের গোবিন্দ সামন্তকে কাছারিতে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জমিদার তাকে এই বলে শাসিয়েছে যে তিন দিনের মধ্যে মাথট না দিলে তাকে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এই কথা শুনে সকলেই রুষ্ট হন। সকলেই জমিদারের এই আদেশকে গরীবের উপর অন্যায়-অত্যাচার বলে মনে করেন। জমিদারের ছেলের বিয়ের জন্যে প্রজাদের কাছ থেকে মাথট আদায়ের চাপ সৃষ্টি করছে জমিদার। ক্ষুব্ধ প্রজার মন্তব্য 'জমিদারের ছেলের বিয়ে হলো তো আমাদের কি? ও তার নিজের ব্যাপার। আমরা খরচ যোগাবো কেন?'

কিন্তু সকলেই জমিদারের ভয়ে ভীত: 'মাথট না দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? জমিদার বড়লোক; তার হাতে একদল লেঠেল আছে'। এ ধরণের কথা শুনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে হাতুড়ীর ঘা মেরে নন্দ বলে ওঠে: 'ইচ্ছে হচ্ছে, জমিদারের মোটা ভুঁড়ির উপর এই হাতুড়ীর এক ঘা বসিয়ে দিয়ে তাকে একেবারে যমের বাড়িতে পাঠিয়ে দিই। তার ছেলের বিয়ে তো আমাদের কি? কোম্পানি বাহাদুর যে খাজনা বেঁধে দিয়েছে আমরা তাই মেনে চলবো।' শেষে অনেক পরামর্শের পর নন্দ বলে বসে: 'ধর্মঘট করলে হয় না?' ['But why not make a *dharmaghat*?' (Chap. XL)]

কিন্তু ধর্মঘটের জন্যে যে সংঘ শক্তির দরকার? সে সংহতি কোথায়? সেজন্যেই গোবিন্দের ভাবনা: 'মুখে বলা সহজ; কিন্তু কাকে নিয়ে ধর্মঘট করবে? গাঁয়ের লোক কি আমাদের মতে সায় দেবে? যদি আমরা মাথট দিতে অস্বীকার করি তাহলে গাঁয়ের পনর আনা লোক জমিদারের ভয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে না। তা কি জান না? পাঁচ-ছজন লোকের ধর্মঘটে কি যায় আসে?' [ঐ]

এইভাবে লালবিহারীদে তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তা-ভাবনারই প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছেন কামারশালার বৈঠকী মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। গ্রামের সাধারণ সহজ-সরল কৃষিজীবী দরিদ্র প্রজা শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে চেয়েছেন ধর্মঘট আন্দোলনের ভিতর দিয়ে। কিন্তু অসহায় দরিদ্র প্রজাদের ভয় ও আশঙ্কা, জমিদারের বিরুদ্ধে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়; তাই কিছু জেদি মানুষের

ধূমায়িত ক্ষোভ অন্যায়ের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে ধর্মঘট স্থাপন করতে চাইছে তারই পূর্বাভাষ *Gobinda Samanta* গ্রন্থটিতে 'কামারাশালায় রাজনৈতিক বৈঠক' অধ্যায়ে উপস্থিত করা হয়েছে।

শুধুমাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে আর কোন গ্রন্থ লেখা না হলেও, ১৮৫৮-তে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ অত্যাচারিত নীলকরের কথা আমরা পেয়ে থাকি।

নীলধর্মঘটের প্রেরণা কেবল শ্রমজীবী মানুষদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তাই দেখা যাচ্ছে যে বাঙলা সাহিত্যেও নীলধর্মঘট একটি উদ্দীপণীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। যথার্থই বাঙলা সাহিত্যে নীলবিদ্রোহ—যাকে যোগেশচন্দ্র বাগল নীলবিদ্রোহ নয়, নীলধর্মঘট আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই নীলধর্মঘটই একটা নবযুগের সৃষ্টি করেছিল। এই যুগসাহিত্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজী আব্দুল ওদুদ বলেছিলেন এ-সময়ে যে 'অমৃত ফলটি' ফলে তা ভবিষ্যতে গণজাগরণের কাজেও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।[১৭]